এসো আল্লাহর পথে

চতুর্থ সংখ্যা // মে - ২০১৩

- ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস
- নারী অধিকার ও নারী নির্যাতনের তীর্থভূমি
- আমাদের লাঞ্ছনার কারণ : দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং কিতালকে অপছন্দ করা

মূল্য : ২০ টাকা (নির্ধারিত)

যোগাযোগ ঠিকানা
মারকাজুল উলুম আল-ইসলামিয়া
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপু
মোবাইল : ০১৭৭০২০২৩৫৭, ০১৭১২১
ইমেইল : attibyean@gmail.com
ওয়েব : www.attibyean.tk

সম্পাদকীয়

আমাদের আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন, কালো। অথৈ অন্ধকারের ভয়ানক দাপাদাপি সর্বত্র। গজবের গমনাগমন আর বিপদের ঘনঘটায় জনজীবন স্তব্ধ। এ কালোমেঘ কি এমনিতেই এসেছে? নিজে নিজেই হাজির হয়েছে বিপদের ঘনঘটা? অন্ধকারের কালোঝড় কোন আক্রোশে থাবা বসাচ্ছে আমাদের উপর?

ভেবে দেখার সময় এসেছে!

পাঠক গজব এমনিতেই আসে না। এসব আমাদের হাতের কামাই, উপার্জন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া লন্ড ভন্ড হলো ঝড়ে। সাভারে বিল্ডিং ধ্বসে মৃত্যু হলো অসংখ্য মানুষের। তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই। কিন্তু ভাবা উচিত! এসব কিসের ফল?

এসব কি গজব নয়? সিরিয়ায় প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ মুসলমান। আফগানিস্তানে সম্ভ্রমহারা মা-বোনের কান্না দিন দিন বাড়ছে। মালির আকাশ ভারি হচ্ছে মজলুমের কান্নায়। আর মিয়ানমার যেনো মুসলমানের গণকবর, বধ্যভূমি। যেনো মুসলিম পরিচয়ে জন্ম নেয়াই অপরাধ সেখানে! মৃত্যুই যেনো ওদের নিয়তি। কদিন পর পর রহিঙ্গা হত্যালীলায় মেতে উঠে রাখাইনরা।

কই! আমরা তো দাঁড়াই নি ওদের পাশে! কান্নার উপচে পড়া অশ্রুতো মুছে দেইনি তাদের! আমরা তো ভাগ নিতে পারিনি ওদের দু:খের! কিন্তু দাবির বেলায় তো ষোলো আনাই দাবি করি,

ওরা আমাদেরই মা! আমাদেরই বোন! আমাদেরই পরম আত্নীয় মুসলমান! কিন্তু রাখাইনদের হাতে রোজ ওরা সম্ভ্রম হারায় আর আমরা খেল তামাশায় লিপ্ত! জলন্ত আগুনে পুড়ে মরে অবুঝ শিশুরা আর আমরা শুধু আফসোস করেই দায়িত্বের সমাপ্তি টানি! গরম তেলে ভেজে হত্যা করে পুরুষদের আর আমরা দু'আ করে জিহাদের তৃপ্তি অনুভব করি! ড্রোন হামলায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যা করা হয় আর আমরা আমেরিকার শিখানো বুলি আওড়াই– মুজাহিদদের বলি সন্ত্রাসী, জঙ্গি। পাঠক! আসুন একটু ভাবি! কি করার ছিলো আমাদের আর কি করছি আমরা! আমরা কি 'আমর বিল মা'রুফ নাহিআনিল মুনকার' তথা জিহাদকে ছেড়ে দেইনি? এভাবেই কি আমরা টেনে আনিনি এই গজব? নিজেরাই কি বরণ করে নেইনি করুণ পরিণতি?

আসুন ভাবি!

আসুন মুনাফিকি ছাড়ি!

আসুন জিহাদের দিকে ফিরে যাই!

আসুন সত্যিকারের মুজাহিদ হই!

আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন।

গরম তেলে ভেজে হত্যা করে পুরুষদের আর আমরা দু'আ করে জিহাদের তৃপ্তি অনুভব করি! ড্রোন হামলায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যা করা হয় আর আমরা আমেরিকার শিখানো বুলি আওড়াই– মুজাহিদদের বলি সন্ত্রাসী, জঙ্গি। পাঠক! আসুন একটু ভাবি! কি করার ছিলো আমাদের আর কি করছি আমরা!

সাইবার ক্রাইম

মুহিবুল্লাহ

সাইবার ক্রাইম আজ সর্বগ্রাসীরূপ নিয়েছে। ছেলে-মেয়ে থেকে শুরু করে সমাজের সব বয়সী মানুষই আজ সাইবার ক্রাইমের শিকার। বিশেষত উঠতি বয়সী যুবক যুবতীরা এর ফাঁদে পড়ে ধবংস হচ্ছে ক্রমাগত। কম্পিউটারের কল্যাণে বেড়ে গেছে ইন্টারনেটের মিস ইউজ। পাড়া মহল্লায় গজিয়ে উঠা 'সাইবার ক্যাফে' গুলোতে প্রায়ই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ছেলে-মেয়েরা। মূল্যবান সময় শেষ করে দিচ্ছে ইন্টারনেটের মিসইউজ করে। তাছাড়া মোবাইলের সহজলভ্যতার কারণেও বেড়ে গেছে এর আক্রমণ। মেমরী কার্ডে অশ্লীল দৃশ্যের স্থিরচিত্র বা ভিডিওচিত্র দেখে নিজেদের বিকৃত যৌন লালসার প্রতি ঠেলে দিচ্ছে পরিণাম না ভেবেই। বাবা মায়েরা আজ শঙ্কিত। তাদের দাবি, সমাজের কল্যাণে সাইবার ক্যাফে ও সিডির দোকানগুলোতে সরকারি নজরদারি বাড়ানো উচিৎ।

বরগুনা, বরিশাল

রঙিন পত্রিকা চাই

ফারিহা আক্তার বুশরা

আধুনিক পৃথিবী আজ নানারঙে বর্ণিল। রঙের বৈচিত্রময় ব্যবহার সর্বত্র। অতিসাধারণ বস্তুও অনন্যসাধারণ হয়ে উঠে রঙের ছোঁয়ায়। রঙ মেখে সুন্দর আরো সুন্দর হয়ে উঠে, হয়ে উঠে সুন্দরময়। তাই আমরা চাই আমাদের প্রিয় পত্রিকা 'আত তিবইয়ান' রঙিন হয়ে উঠুক। নানা রঙের ছোঁয়ায় সাজুক তার শরীর। চোখ ধাঁধানো রঙের ব্যবহারে ঝলসে উঠুক তার রূপলাবন্য।

কাপাসিয়া, গাজিপুর

লুঙ্গি ফালতু পোষাক?

হুমায়রা

লুঙ্গি আমাদের প্রত্যহিক জীবনের অপরিহার্য বস্ত্র। ঐতিহ্যবাহি পোষাক। সমাজে লুঙ্গির ব্যবহার আদিকাল থেকেই। লুঙ্গি গ্রামবাঙলার অতি প্রয়োজনীয় পোষাকের অন্যতম। সেই সাথে লুঙ্গি ফ্যাশনেরও অংশ। আমাদের জাতিগত ইতিহাসের সাথেও লুঙ্গি জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। পুরান ঢাকাইয়াদের আবশ্যকীয় সাজ পোষাক লুঙ্গি।

অথচ সম্প্রতি ঢাকার বারিধারায় লুঙ্গি পরিহিত রিকশাওয়ালাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বারিধারাস্থ বাড়িওয়ালা সমিতির কাছে এটি কি তবে প্রেস্টিজ পাংচার বস্ত্র?

তারা কি লুঙ্গি নিষিদ্ধের আবরণে অপরিহার্য, ঐতিহ্যবাহি পোষাকটিকে অপমান করলো না?

মধুবাগ, ঢাকা
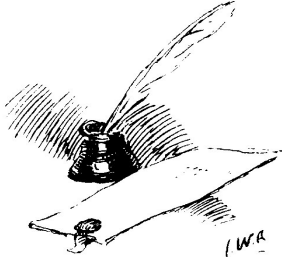
যা কিছু কালো তার সাথে প্রথম আলো

আমীম ইহসান

প্রথম আলো ধন্যবাদ পাবার মতো একটি কাজ করেছে। ধন্যবাদ প্রথম আলো, ধন্যবাদ হাসনাত আব্দুল হাই। গত ১৪ই এপ্রিল প্রথম আলোয় প্রকাশিত গল্প 'টিভি ক্যামেরার সামনে মেয়েটি' গণজাগরণ মঞ্চের উপর পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বোমার আঘাতে তাদের পৈশাচিক জৈবিক চরিত্র প্রকাশ হয়ে গেছে। একুশে পদকপ্রাপ্ত হাসনাত আব্দুল হাই যদিও জাগরণমঞ্চ ঘরানার লোক তবুও লাকীর মতো মেয়েদের অসহায়ত্ব তার বিবেকের দরজায় কড়া নেড়েছে। গল্পে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন কিভাবে গ্রামের, মফস্বলের অসহায় মেয়েরা

প্রথম আলো

নারীবাদী প্রগতিশীলদের হাতে নিপীড়িত হয়ে অমূল্য সম্পদ সতিত্ব বিসর্জন দেয়। কিভাবে সম্ভ্রম বিক্রির বিনিময়ে হয়ে উঠে আজকের লাকী। যৌবনদীপ্ত শরীর নিয়ে উড়না বিহীন মঞ্চে উঠার সামান্য অধিকারটুকু পেতে গিয়ে সম্ভ্রমের মতো অমূল্য সম্পদ তাদের হারাতে হয়। আর ক্ষুধার্ত, যৌনাচারী, সুযোগসন্ধানী নেতারা কিভাবে তাদের নাইট পার্টনার করে। এই প্রগতিশীলরাই নাকি নারীর মর্যাদা রক্ষা আর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। ছি : ছি : তোদের ছি :।

থুথু পড়ুক যৌনাচারী এসব নেতা নামের কুলাঙ্গারদের মুখে।

দেশ ও ইসলাম বিরোধী ব্লগ নিষিদ্ধ করা হোক

উমর রায়হান

দেশ ও ইসলাম বিরোধী নাস্তিকরা এবার সুযোগ পেয়েছে। জামাতের ৭১ এর অপকর্মের বিচার পুরো জাতিই চায়। কিন্তু ইসলাম বিরোধী নাস্তিকরা চায় জাতির আবেগকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের কাঁধে ভর করে পুরো দেশ এবং জাতির সামনে ইসলামকে অবমাননা করতে। রাসূল সা. তার পবিত্র স্ত্রীগণ, ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলীর উপর তারা আক্রোশ ঝাড়ছে। তাদের সকল অন্যায় চাহিদা তারা এই সরকারের কাঁধে ভর করেই বাস্তবায়ন করে নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে গেছে।

ইতোমধ্যে অনলাইনে দেশ-জাতি ও ইসলাম বিরোধী নাস্তিকদের অনেক অপকর্মের সামান্য কিছু রিপোর্ট আসা শুরু হয়েছে। কিন্তু যারা ব্লগ, ফেসবুক এবং নেট থেকে বঞ্চিত তারা তাদের জন্য এই অঙ্গনের ভয়াবহতাটি বুঝতে একটু সময় লাগবে।

আমরা যারা বিগত দুই-আড়াই বছর যাবত এই জগতে বিচরণ করছি, তারা প্রতিনিয়তই দেখছি এই অঙ্গনের অশ্লীলতা, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ, আক্রমণ এবং তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে পেলে-পুষে বড় করার প্রবণতা।

এই মেইলের নিচের দিকে তাদের অপকর্মের চিত্র খানিকটা তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবতা এর চাইতেও ভয়াবহ। সামান্য গুটি কতেক নিকৃষ্ট ব্যক্তি তথ্য-প্রযুক্তির উপর ভর করে একেকজন ১০-২৫ টি করে ছদ্মনামে নেটে দেশ-জাতি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে বিগত প্রায় ৩ বছরাধিককাল যাবত। আর তাদের সবচেয়ে বেশি সমর্থন, সহযোগিতা ও অন্যায়ের অব্যাহত সুযোগ দিচ্ছে–

'সামহোয়ার ইন ব্লগ ডট নেট
http://www.somewhereinblog.net/
আমার ব্লগ
http://www.amarblog.com/
মুক্ত মনা,
http://www.mukto-mona.com/home/
যৌবনযাত্রা
http://joubonjatra.com/home.html
ধর্মকারী,
http://www.dhormockery.com/'

নামক সীমাহীন বিকৃত ও কুরুচিপূর্ণ ব্লগ কর্তৃপক্ষ। এই সকল ব্লগের মধ্যে প্রথম ব্লগটির মালিক একজন খৃষ্টান যার নাম অরিল। তার স্ত্রী 'জানা' মুসলিম নামধারী একজন কট্টর ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক ও দেশবিরোধী। তারা এই ব্লগের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। এই ব্লগে অতীতেও ইসলাম ও দেশবিরোধী অনেক লেখা ধারাবাহিকভাবে ষ্টিকি করা হয়েছে। এখনও করা হচ্ছে।

তাদের ভুল তথ্যে ভরপুর ও মিথ্যাচারের বিরোধীতা কেউ করলে সাথে সাথে তাকে ব্লক করে দেয় এবং এরপর ব্যান্ড করে একেবারে নিষিদ্ধ করে দেয়। এই ব্লগেরই এক সময়ের ব্লগার অমি রহমান পিয়াল বর্তমানে আমার ব্লগ নামে আলাদা একটি ব্লগ করেছে। এছাড়া এরাই নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্ত চিন্তার কথা বলে প্রথমে তাদের সাথে মিশে।

এরপর তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে নাস্তিকতার বীজ বপন করে। নিজেদের গোপন মিটিংয়ে তাদের প্রথম রিক্রুট কর্মীদের জন্য তারা সম্পূর্ণ ফ্রি গাঁজা, হেরোইন ও মদ্যপানের ব্যবস্থা রাখে। অবাধ মেলা-মেশার সুযোগে তারা তাদেরই দলে আসা নারীকর্মীদের সাথেও আন্তরিক সখ্যতা গড়ে তোলে। এর ফলে একসময় তাদের এই সম্পর্ক শারীরিক পর্যায়ে গড়ায়। এরপর নারীর ক্ষতি করে যখন বিপ্লবের তকমা ধারী, মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারীরা কেটে পড়তে চায় তখন সেই নারী অবলা হলে এটি এমনিতেই হারিয়ে যায়। কিন্তু সেই নারীর পরিবার বা আত্মীয়রা শক্তিশালী হলে তারা প্রতিশোধ নেয়। যার কারণে প্রায়ই এই ফিৎনাবাজ দেশবিরোধী গ্রুপটির মধ্যে আভ্যন্তরীণ খুনো-খুনি স্বার্থের দ্বন্দ চলতে থাকে।

এভাবে একসময় তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া তরুণটি নিজের অজান্তেই একজন গাঁজাখোর, মদ্যপ ও বিকৃত মস্তিস্কের এবং খুনী হয়ে ওঠে।

এরপর তারা নূন্যতম মনুষ্যত্ব হারিয়ে হয়ে ওঠে এক একজন ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন। এই পর্যায়ে তাদের দিয়ে তাদের পেছনের গুরুরা ইসলামের উপর আঘাত হানতে শুরু করে। নেশার ঘোরে তারা কতটা কদর্য ভাষায় যে আক্রমণ করতে থাকে সেটি তারা কল্পনাও করতে পারে না।

দেশব্যাপী বর্তমানে তাদের অপকর্মের প্রতিবাদ শুরু হলেও এখনও তারা থেমে নেই। আজকে সকালেও সামহোয়ার ব্লগে ইসলামকে এমনকি মহান আল্লাহকে অবমাননা করে পোষ্ট দেয়া হয়েছে।

এই অপকর্মের মূল হোতারা হচ্ছে–
আসিফ মহিউদ্দীন, অমি রহমান পিয়াল, পারভেজ আলম, মুক্তা বাড়ৈ, আরিফুর রহমান, কে এম মাহদী হাসান, আরিফজেবতিক, রনী রায়, তামান্না ঝুমু, সাদিয়া সুমি, ইকবাল সুলতানা রিনি প্রমুখ হাতে গোনা কিছু ব্লগার নামধারী অমানুষ। আর তাদের সবচেয়ে বেশি মদদ দিচ্ছে সামহোয়ার, আমার ব্লগ, ও মুক্তমনা।

ব্যবহৃত কিছু ছদ্মনাম:
এক্সট্রাটেরেষ্ট্রিয়াল স্বর্ণা, রিমন ০০৭, শয়তান, টেলি সামাদ, ব্ল্যাক ম্যাজেশিয়ান, ছন্নছাড়া, মেজো ছেলে, পুণ্টা ইত্যাদি নাম থেকে সীমাহীন মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালানো হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

তাই অনতিবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া আজ লাখো জনতার দাবি। এই সকল কুলাঙ্গারদেরকে রক্ষার চেষ্টা করা হলে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তাই এদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়াই দেশ, জাতি ও ইসলামের জন্য কল্যাণকর হবে। আশাকরি সকলে বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করবেন।

রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে কটাক্ষকারীরা মুরতাদ

শায়খুল হাদিস মুফতি জসীমুদ্দীন রাহমানী

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَـيْهِمْ سُـورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ – وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِـهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ – لَا تَعْتَذِرُوا قَـدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

'মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বলো, 'তোমরা উপহাস করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ'। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করো, অবশ্যই তারা বলবে– 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম।' বলো, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো।'

(সুরা তাওবা, ৯ : ৬৪-৬৬)

আয়াতের শানে নুযুল

পবিত্র কুরআনের কিছু কিছু আয়াত বিশেষ ঘটনা অথবা বিশেষ প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে নাযিল হয়েছে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও বিধানের ব্যাপারে একটি সাধারণ উসূল হলো 'নুযুলে আম হুকুমে খাস'। অর্থাৎ যদিও নাযিল হয় বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিন্তু তাতে বর্ণিত বিষয়টি সর্বকালের সকল স্থানের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের আজকে আলোচ্য আয়াতটিও একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর যে সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে কোনো আয়াত নাযিল হয়, তাকে ঐ আয়াতের শানে নুযুল বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হাদিস ও তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে –

عن عبد الله بن عمر قال : قال رجـــل في غزوة تبوك في مجلس يوما : ما رأيت مثـــل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكـــذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء فقال رجـــل في المجلس : كذبت ولكنك منـــافق لأخـــبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القـــرآن قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقـــة رسول الله صلى الله عليه وســـلم تنكبـــه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله : (إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صـــلى الله عليه وسلم يقـــول : « (أبـــالله وآياتـــه ورسوله كنتم تستهزئون

'আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কোনো এক মজলিসে এক ব্যক্তি (মুনাফিক) বললো– 'আমাদের এই আলেমদের মতো অন্য কাউকে এতটা পেটপূজারী, এতটা মিথ্যাবাদী এবং

'মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বলো, 'তোমরা উপহাস করতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ'। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করো, অবশ্যই তারা বলবে– 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম।' বলো, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো। (সুরা তাওবা, ৯ : ৬৪-৬৬)

শত্রুর মোকাবেলায় এতটা কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি।' তখন অই মজলিসের একব্যক্তি বললেন– 'তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি একটা মুনাফিক। আমি অবশ্যই, তোমার এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানাব।' পরবর্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানলেন এবং এদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটিও নাযিল হয়ে গেল।

শাব্দিক তাহকিক

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ 'মুনাফিকরা ভয় করে' অর্থাৎ মুনাফিকরা সবসময় আতঙ্কিত থাকে। কখন যেন তারা ধরা পরে যায়। তাদের মুনাফিকি প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন প্রবাদ আছে- 'চোরের মনে পুলিশ পুলিশ'।

أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ 'তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে'। অর্থাৎ তাদের অবস্থা বর্ণনা করে কোনো সূরা নাযিল হয়ে যায় কিনা, যার মাধ্যমে তাদের গোপন চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে তারা অপমানিত হয়ে পড়বে।

تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ 'যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে'। অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে অথবা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লুকায়িত আছে।

قُلِ اسْتَهْزِئُوا 'বলো– 'তোমরা উপহাস করতে থাকো'। এখানে তাদের ধমক দেওয়া হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ 'নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ'। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের মুনাফিকি আল্লাহ (সুব.) সকল মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিবেন।

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম'। এটাই মুনাফিকদের চরিত্র যখন তারা ধরা পড়ে কিংবা তাদের মুনাফিকি প্রকাশ পেয়ে যায় তখন তারা বিভিন্ন অজুহাত ও বাহানা তালাশ করতে থাকে।

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

'বলো, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? অর্থাৎ তোমরা বিদ্রুপ করার আর কোনো জিনিষ খুঁজে পেলে না। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াতকেই খুঁজে পেলে তামাশা ও বিদ্রুপ করার জন্য।

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

'তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো'। অর্থাৎ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে কোন প্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করলে সে মুসলিম থাকে না। বরং সে মুরতাদ হয়ে যায়।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয়

ক. মুনাফিকদের মনের অবস্থা কিরূপ তা জানা গেল। তারা সবসময় দূর্বল থাকে। তাদের মুনাফিকি প্রকাশ পায় কিনা সেই আতঙ্কে থাকে।

খ. আল্লাহ (সুব.) মুনাফিকদের অবস্থা প্রকাশ করে দেন। যেমন এই আয়াতে বলা হলো। অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) সুস্পষ্টভাবেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের গোপন বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না? (তা ঠিক নয় আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দিবেন।' (মুহাম্মদ ৪৭ : ২৯)

গ. যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তারা যতই ঈমানের দাবি করুক না কেন মূলত তারা কাফের ও মুরতাদ। বর্তমানে এদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একটি বিশেষ দলের সাধারণ কর্মী সমর্থকদের পর্যন্ত বলতে শুনা যায় যে, কাউকে নাস্তিক বলা ঠিক নয়। কে নাস্তিক কে আস্তিক তা আল্লাহ জানেন। আপনি বলার কে? ইত্যাদি। তাদের কথা শুনলে মনে হয় যেন তারা খুবই আল্লাহ ওয়ালা। কিন্তু বাস্তবে এটিও মুনাফিকদের চরিত্র। কেননা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা অন্যান্য সাধারণ গুনাহের মত নয়। অন্যান্য সাধারণ গুনাহ করলে তাকে গুনাহগার, পাপী বা ফাসেক বলা হয়। কিন্তু কিছু গুনাহ আছে এ রকম, যে গুনাহগুলো করলে মানুষের ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে লোকটি কাফের ও মুরতাদে পরিণত হয়। যেগুলোকে 'নাওয়াকিদুল ঈমান' বা ঈমান ভঙ্গের কারণ বলা হয়। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর আয়াতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলিমদের নামাজ ভঙ্গের কারণ হয়তো কিছু জানা আছে, অজু ভঙ্গের কারণ হয়তো কিছু জানা আছে, সাওম ভঙ্গের কারণ হয়তো কিছু জানা আছে। কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়ার কারণেই তারা উপরোক্ত আবোল তাবোল কথাগুলো বলে থাকে।

ঘ. মুরতাদদের কোনো ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যারা আল্লাহকে নিয়ে অথবা আল্লাহর আয়াত ও রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করে তারা আর মুসলিম থাকে না বরং তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। আর ইসলাম ত্যাগ করে যারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। এ প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণিত হয়েছে– **قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ**

‘রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করলো তাকে তোমরা হত্যা করো।’ (বুখারী ৩০১৭; তিরমিজি ১৪৫৮;)

আয়াতের শানে নুযুল হিসাবে যেই হাদিসটি পেশ করা হয়েছে সে হাদিসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন– ‘আমি দেখেছি ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উটের রশি ধরে ঝুলছে আর বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো এইগুলো শুধুমাত্র কৌতুক ও খেলনাচ্ছলে বলেছিলাম (অন্তর থেকে বলিনি)।’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– ‘আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে উপহাস করছো? (তোমাদের কোনো ক্ষমা নেই)’ (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, আইসারুত তাফাসীর উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

উপরের হাদিসে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটুক্তি করেছিল তারা কোনো ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান ছিল না বরং নামধারী মুনাফিক মুসলমান ছিল। যারা শুধু নামাজ, রোজা ইত্যাদি করতো তাই নয় বরং তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন। সুতরাং যারা বর্তমানেও আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে কটাক্ষ করে আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তারা কাফের ও মুরতাদ। তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ হিসাবে বিশ্বাস করা ও তা প্রচার করা প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না যে, কে কাফের কে মুসলমান তা আল্লাহ ভালো জানেন, আপনি নাস্তিক বলার কে? বরং এরকম প্রশ্ন ও আপত্তি যারা করে তারাও নাস্তিক মুরতাদদের দালাল হিসেবেই গণ্য হবে। আল্লাহ (সুব.) আমাদের কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন করে সত্যিকার মুমিন হওয়ার তওফিক দান করুন। আমীন!

চলবে, ইনশাআল্লাহ

জিহাদ : ইসলামের একটি মজলুম পরিভাষা

শায়খুল হাদিস মুফতি
মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ

‘আমর ইবনে আবাসা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন- ‘জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন- কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হও। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো– কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম, যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।’ (জামিউল আহাদিস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭, ত্ববরানী। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)

ইসলামের অনেক পরিভাষা রয়েছে, যেমন :- ঈমান, ইসলাম, সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। এর মধ্যে জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো পরিভাষা নিয়ে কারো কোনো মাথা ঘামানো নেই। কেউ জানার চেষ্টাও করে না ওগুলোর শাব্দিক অর্থ কি? বরং সকলেই পারিভাষিক অর্থটি গ্রহণ করেছে। ব্যতিক্রম কেবল জিহাদের ক্ষেত্রে। এখানে সকলেই নিজ নিজ কাজকে জিহাদ বলে চালিয়ে দেয়ার জন্য জিহাদের শাব্দিক অর্থকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে।

কোনো কোনো বন্ধুকে বলতে শুনা যায় যে, اعْلَاءُ كَلِمَةِ الله (ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ) দ্বীন কায়েম বা দ্বীন প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে যে কোনো প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। বলাবাহুল্য, জিহাদ শব্দটি আভিধানিক অর্থে শরিয়ত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায়। ‘শরয়ী নুসূস’ অর্থাৎ কুরআন-হাদিসের কোথাও কোথাও এই শব্দটি কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা ছাড়াও অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু ‘আল জিহাদ ফী সাবি-লিল্লাহ’ যা ইসলামী শরিয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, যার অপর নাম ‘আল-কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ’ বা কাফেরদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা। তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয়। বরং ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ হলো, ‘আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য, কুফুরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের -মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।’ ফিক্বাহ ও ফাতাওয়ার কিতাব সমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই বর্ণনা করা

হয়েছে। সিরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদের নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন হাদিসে জিহাদের ব্যাপারে যেই বড় বড় ফযিলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদ করতে গিয়েই যারা শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত হন তারাই হলেন প্রকৃত শহীদ।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষা ও 'শরয়ী নুসূস' সমূহের উপর নেহায়েত যুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযায়েলসমূহকে দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের **تَحْرِيْــفُ الْمَعْــانِيْ** (তাহরীফুল মা'আনী) অর্থের বিকৃতি সাধন করা, যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুমিনের উপর ফরয। কেননা এটা কোনো মুমিনের চরিত্র নয়। ব্যক্তিগত মতামত বা দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আল্লাহর কালামের অর্থ বিকৃত করা কাফের-মুশরিকদের চরিত্র। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِه وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

'তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া।' (মায়িদা ৫ : ১৩)

শর'য়ী উসূল বা নীতিমালা অনুযায়ী, কুরআন সুন্নাহর আলোকে দ্বীন কায়েমের জন্য রাজনীতি করা (তবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি নয়), তা'লীম, তাযকিয়া, দা'ওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি করা 'আমর বিল মা'রুফ' সৎ কাজের আদেশ ও 'নাহী 'আনিল মুনকার' অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার একটি নতুন পদ্ধতি হতে পারে। আর এসবই স্ব-স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্ম প্রচেষ্টার প্রত্যেকটাই খিদমতে দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলোর ভিন্ন ফাযায়িল, ভিন্ন আহকাম এবং ভিন্ন মাসায়িল রয়েছে। এসবের কোনোটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আবার কোনোটাই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় বা তার ব্যাপারে জিহাদের ফাযায়িল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা নেহায়েত জরুরি। কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফের (বিকৃতি সাধন) প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কেউ তাবলীগের কাজকে জিহাদ বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্ম-প্রচেষ্টা বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছে। কেউ খালি হাতে মিছিল, মিটিং ও লংমার্চ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছে। কারো কারো কথা থেকে এমনও বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের শামিল (নাউযুবিল্লাহ)।
(কিতাবুল জিহাদ পৃষ্ঠা ৩৬)

যারা দা'ওয়াত, তাবলীগ, তা'লীম, তাযকিয়া, রাজনীতি, মিছিল-মিটিং সব কিছুকেই জিহাদ বলে চালিয়ে দেন তারা মূলত জিহাদের শাব্দিক অর্থের আশ্রয় নিয়ে কুচতুরভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই আমরা ইসলামী শরিয়তের অন্যান্য কিছু আমল নিয়ে আলোচনা করে দেখবো যে, সে সব ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, না পারিভাষিক অর্থ?

সালাত, সওম, হজ্জ, যাকাত সকল ক্ষেত্রেই পারিভাষিক অর্থ গ্রহণযোগ্য, শাব্দিক অর্থ মুখ্য বিষয় নয়। **صَــلَاةٌ** (সালাত) এর শাব্দিক অর্থ : দোয়া, নিতম্ব হেলানো। আর ইসলামের পরিভাষায় **صَــلٰوةٌ** (সালাত) হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করে কিয়াম, রুকূ, সেজদা, জালসা ইত্যাদিসহ সালাম ফিরানো পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটি বিশেষ ইবাদতের নাম।

এখন **صَــلَاةٌ** (সালাত) শব্দ উল্লেখ করলে সাধারণ মুসলিমগণ সালাতের পারিভাষিক অর্থই বুঝে থাকে এবং বিশেষ নিয়মে ইবাদতকারীকেই মুসল্লি বা সালাত আদায়কারী বলা হয়। শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী শুধু দোয়া করাকে বা কিছুক্ষণ নিতম্ব হেলানোকে সালাত বলে না। আর এ কাজ যে করে তাকে কেউ মুসল্লি বা সালাত আদায়কারী বলে না।

حَــجٌّ (হজ্ব) শব্দের আভিধানিক অর্থ **اَلْقَــصْدُ** বা ইচ্ছা করা। কেউ যদি ঘরে বসে বসে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করে তাকে কেউ হাজি বা হজ্ব আদায়কারী বলে না। বরং নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট কিছু কাজ করাকেই 'হজ্ব' বলে। আর ঐ কাজগুলো যে ব্যক্তি করে তাকেই হাজি বলে।

اَلصَّوْمُ (সওম) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। বহুবচন হল **اَلـــصِّيَامُ** (সিয়াম)। ইসলামের পরিভাষায় নিয়তসহ সুবহে সাদিক হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকেই 'সাওম' বলে এবং এই পুরো সময় যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত তিন কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকেই সিয়াম পালনকারী বলা হবে। অথচ শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে সামান্য সময় বিরত থাকাকেও সাওম বলা উচিত। মোটকথা : এসব ক্ষেত্রে সকলেই পারিভাষিক অর্থকেই গ্রহণ করেছে। এগুলোর শাব্দিক অর্থ কি? তা হয়তো অনেকেই জানে না বা জানার চেষ্টাও করে না।

কেবলমাত্র জিহাদের বিষয়টিই এর ব্যতিক্রম। যারা আরবি না জানে তারাও এর শাব্দিক অর্থ জানার চেষ্টা করে। বিশেষ করে পীরের মুরীদ, প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের সাধারণ অনুসারী, রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মী সকলেই নিজ নিজ কর্মকে জিহাদ বলে অখ্যায়িত করে। কেউ নফসের জিহাদ, কেউ কলমের জিহাদ, কেউ জিকিরের জিহাদ, কেউ বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিলের জিহাদ আবার কেউ কেউ দীর্ঘ বয়ান করে মুরগীর রান চিবায় আর বলে যে, এটাও একটা জিহাদ। কারণ এতেও কম কষ্ট করা হচ্ছে না। মেয়েলোক বাচ্চাকে দুধ পান করায় আর বলে এটাও জিহাদ। তাহলে, আমরা বলবো স্ত্রী সহবাস করাও জিহাদ। কেননা হাদিসে ঐ ক্ষেত্রেও

জিহাদ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর চার অঙ্গের মাঝখানে বসে অতঃপর জিহাদ করে (পরিশ্রম করে) তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যাবে।' (বুখারী ২৯, মুসলিম ৮০৯, ইবনে মাজাহ ৬১০, বায়হাকী ৭৯৩, মেশকাত ৪৩০)

এভাবে জিহাদ থেকে মুসলিম যুবকদের দূরে সরানোর জন্য জিহাদের শাব্দিক অর্থকে কেন্দ্র করে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাটির বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত করা হয়েছে। অথচ আলোচ্য হাদিসে দেখা গেল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো জিহাদ কি জিনিষ তখন তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই হলো জিহাদ। তাছাড়া মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ সকলেই হাদিসের কিতাবে জিহাদের অধ্যায়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হাদিসগুলোকেই বর্ণনা করেছেন। নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, বক্তৃতার জিহাদ বিষয়ক কোনো হাদিস সেখানে উল্লেখ করেন নি। মদিনার অলি-গলিতে যখন **حَيَّ عَلَى الْجِهَاد** এর আজান (ঘোষণা) হতো তখন সাহাবায়ে কিরাম পাগড়ি আর জায়নামাজ নিয়ে যিকির আর নফসের জিহাদ করার জন্য ছুটে আসতেন না বরং তারা লোহার পোষাক পরে, হাতে তীর-ধনুক, তরবারী আর বর্শা নিয়ে উটে বা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে ছুটে আসতেন। সুতরাং জিহাদ বলতে সাহাবায়ে কিরাম, মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফুক্বাহায়ে কিরাম ও সকল সালাফে সালেহীনগণ যে অর্থ বুঝেছেন সেটাই জিহাদের সঠিক অর্থ। এমনকি বর্তমান যুগের কাফির-মুশরিকরাও জানে জিহাদ অর্থ কী? বাংলাদেশের প্রত্যেক মসজিদে মুজাহিদ কমিটি থাকলেও কাফের-মুশরিক, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের কিছুই বলে না বরং তাদেরকে নিজেদের সহযোগিই মনে করে কিন্তু যদি কোনো জায়গায় কয়েকজন মুসলিম যুবক অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয় বা সামান্য ব্যায়াম করে তখনই কাফিররা তাদেরকে টার্গেট করে ও তাদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যায়, বোমা হামলা চালায়, ড্রোন হামলা চালায়। অপর দিকে তথা কথিত মুজাহিদ কমিটির সদস্যরা বিশাল বিশাল সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং অথবা যিকিরের আওয়াজে মসজিদ ফাটিয়ে ফেললেও কুফ্ফাররা তাদের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না। সময়ের অপচয় মনে করে তাদের কোনো খোঁজ-খবর নেয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। বুঝা গেল, সত্যিকার জিহাদ কোনটি তা কাফের-মুশরিকরাও জানে। অথচ অধিকাংশ মুসলিমরা তা জানে না। আরবদের এ এক সৌভাগ্য যে, সেখানকার সরকারপন্থী আলেমরা জিহাদ ভিত্তিক ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের নিবৃত্ত করার জন্য আজ পর্যন্ত অনেক কৌশল অবলম্বন করলেও জিহাদের অর্থ বিকৃত করার মত বোকামিপূর্ণ কৌশল এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। তারা কুরআন-হাদিসকে পাশ কাটিয়ে জিহাদ এখন ফরয নয়, উচিত নয় বা আমাদের জিহাদ করার মতো শক্তি-সামর্থ কোথায় ইত্যাদি বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ঠিকই। তবে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে দাবি করে না। ইসলামে জিহাদের পারিভাষিক অর্থ 'কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা' এ কথাই বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে লিখিত সকল আরবি কিতাব সমূহে উল্লেখিত হয়েছে। এমনকি আপনি এ যুগে লিখিত যে কোনো আরবি অভিধান খুলে দেখুন, এ কথা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। আফ্রিকা বা অন্যান্য দেশের কথা জানি না। তবে আমাদের উপমহাদেশে যে অনেক দিন থেকে জিহাদের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে, তা জানতে পেরেছি। উপমহাদেশ যেহেতু অনারব ভাষী এবং দীর্ঘকাল থেকে আজ পর্যন্ত শাসন, বিচার ও শিক্ষা ব্যবস্থা খৃস্টান ও ইংরেজদের আদর্শ ও ধ্যানধারণা কর্তৃক পরিচালিত সেহেতু এ দেশের মুসলিমদের কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অপূর্ণ থাকাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য কিছু কিছু কাজকে হাদিসে জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : **الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ** 'যে নফসের সাথে জিহাদ করে সেই মুজাহিদ।' (তিরমিজি ১৬২১; মুসনাদে আহমদ ২৩৯৫১)

এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো জিহাদের চেয়েও বড় বরং এ ধরনের হাদিসের অর্থ হলো, জিহাদের সঙ্গে ঐ কাজগুলোকে তুলনা করে ঐ কাজগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা। যেমন কোনো একজন যুবক তার বৃদ্ধ বাবার প্রতি খুবই দূর্বল। সবসময় তার খেদমত করে। আপনি তার কাছে একজন অসহায় বৃদ্ধকে পেশ করে বললেন- 'এই বৃদ্ধকে তোমার বাবার মতো জানবে, তার প্রয়োজনীয় খেদমত করবে।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ যুবক যে তার বাবার প্রতি দূর্বল সেটাকে কাজে লাগিয়ে এই অসহায় বৃদ্ধের খেদমত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এতে ঐ বৃদ্ধ লোকটি বাস্তবেই তার পিতা হয়ে যায় না। এমনিভাবে এদেশের স্কুল-ভ্যান ও রিকশা চালকদের শহরের শিক্ষিত ছেলেরা মামা ডাকে। এর অর্থ এই নয় যে, মায়ের আপন ভাই যে অর্থে মামা এই রিকশা ওয়ালাও সেই অর্থে মামা। বরং মামা একটি অত্যন্ত আপন শব্দ। মামা যেরকম ভাগ্নের উপরে স্নেহ, ভালোবাসার ছায়া দিয়ে রাখে ঠিক তদ্রুপ এই রিকশাওয়ালাও যেন তার গাড়িতে চড়া শিশুদের ভালোবাসে সেই সুযোগটা নেওয়াই উদ্দেশ্য। এরকম গ্রামে বাবা বয়সি লোকদের চাচা ডাকা হয়। এর অর্থ এই নয় সে বাবার আপন ভাইয়ের মতো চাচা হয়ে গেল। তাই কুরআন-হাদিসের কিছু কিছু জায়গায় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা ছাড়াও অনেক কাজকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সেটি মূল জিহাদ। বরং জিহাদের সঙ্গে তুলনা করে ঐ কাজটির গুরুত্ব বুঝানোই উদ্দেশ্য। তাই আসুন! জিহাদের অর্থের ব্যাপারে কোনো প্রকার বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে মুসলিম যুবকদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন! আল্লাহ (সুব.) আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন!

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

মুফতি জসীমুদ্দীন রাহমানী

প্রেক্ষাপট

পহেলা মে বিশ্বব্যপী শ্রম দিবস পালিত হচ্ছে। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকদের অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই চতুর্দিক থেকে নানা বক্তব্য শুনা যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ নারী শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলে ইসলামের পর্দার বিধানের বিষয়টিকেও টেনে আনার চেষ্টা করছে। এমনকি নারীদেরকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের জোর পূর্বক জড়ো করে ইসলাম বিরোধী নাস্তিক মুরতাদরা মহা সমাবেশ করার চক্রান্ত করছে। তাই এ প্রেক্ষাপটে ইসলামে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকদের অধিকার ও বিশেষ করে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন। তাই আজকের আলোচ্য বিষয় 'ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস'।

মে দিবস কি ও কেনো?

১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার মেহনতি শ্রমিকশ্রেণী দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবি সহ আরো কয়েকটি ন্যায্য দাবি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলো। পহেলা মে এর ঐ ধর্মঘট দিবসের আগে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কোনো অমুসলিম দেশে শ্রম আইন বলতে কিছু ছিলো না। শ্রমিকদের মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বলতেও কিছু ছিল না। তারা ছিল মালিকের দাস মাত্র। তাদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ছিল না সাপ্তাহিক কোনো ছুটি। ছিল না চাকুরীর স্থায়িত্ব ও ন্যায়সঙ্গত মজুরির নিশ্চয়তা। মালিকরা তাদের

ইচ্ছামত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। এমনকি দৈনিক ১৮-২০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতেও বাধ্য করত শমিকদের। এ অন্যায়, বঞ্চনা ও যুলুমের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা পর্যায়ক্রমে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এ আন্দোলনের অংশ হিসাবে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' এর ১৮৮৫ সালের সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকা ও কানাডার প্রায় তিন লক্ষাধিক শ্রমিক শিকাগোর 'হে মার্কেটে' ঢালাই শ্রমিক, তরুণ নেতা এইচ সিলভিসের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিকদের সমাবেশ চলাকালে মালিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী পুলিশ ও কতিপয় ভাড়াটে গুন্ডা সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে অতর্কিতভাবে গুলি চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা ও শতাধিক শ্রমিককে আহত করে। কিন্তু এতেও শ্রমিকরা দমে যায়নি। শ্রমিকদের ইস্পাতকঠিন ঐ সফল ধর্মঘটের কারণে কোনো কোনো মালিক ৮ ঘন্টা কর্ম সময়ের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রমিকরা আরো উৎসাহী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে এবং সর্বস্তরে ৮ ঘন্টা কর্ম সময়ের দাবি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২রা মে রবিবারের সাপ্তাহিক বন্ধের দিনের পর ৩ তারিখেও ধর্মঘট অব্যাহত রাখে।

ঐ নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত ৪ঠা মে শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটের বিশাল শ্রমিক সমাবেশে আবারো মালিকগোষ্ঠীর গুন্ডা ও পুলিশ বাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করে। এতে ৪ জন শ্রমিক নিহত ও বিপুল সংখ্যক আহত হয়। রক্তে রঞ্জিত হয় 'হে' মার্কেট চত্বর। গ্রেফতার করা হয় শ্রমিক নেতা স্পাইজ ও ফিলডেনকে। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের পর শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত 'চিরুনী অভিযান' চালিয়ে শিকাগো শহর ও এর আশপাশের এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ফিশার, লুইস, জর্জ এঞ্জেল, মাইকেল স্কোয়ার ও নীবেসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক নেতাকে।

পরবর্তিতে শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের বিরোধী মালিকপক্ষের সমন্বয়ে 'জুরি' গঠন করে ১৮৮৬ সালের ২১ জুন শুরু করা হয় বিচারের নামে প্রহসন। একতরফা বিচারের মাধ্যমে ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর ঘোষিত হয় বিচারের রায়। রায়ে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে শ্রমিক নেতা পার্সন্স, ফিলডেন, স্পাইজ, লুইস, স্কোয়ার, এঞ্জেল ও ফিশারের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয় এবং ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর সে আদেশ কার্যকর করা হয়। শ্রমিক নেতা ও কর্মী হত্যার এ দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিবছর ১লা মে 'শ্রমিক হত্যা দিবস' ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দৈনিক ৮ ঘন্টা কার্য সময় ও সপ্তাহে এক দিন সাধারণ ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রথম শ্রম আইন প্রণীত হয়। অন্যদিকে নারকীয় এ হত্যাজ্ঞ গোটা বিশ্বের শ্রমিকদের অধিকারে এনে দেয় নতুন গতি। শিকাগো শহরে সৃষ্ট এ আন্দোলন ক্রমশ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী মানুষ এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানটি। সেই সাথে ১২৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া সে ঘটনাটির কথা এখন প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে 'বিশ্ব শ্রমিক দিবস' বা 'মে দিবস' হিসাবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে 'মে দিবস'

পৃথিবীর অবহেলিত নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত মজলুম শ্রমিকদের পক্ষে সর্বপ্রথম আওয়াজ বুলন্দ করেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি দাস-দাসী ও শ্রমিকদেরকে মালিকের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিজে যা খাবে শ্রমিকদের তা খাওয়াতে বলেছেন। নিজে যা পরিধান করবে দাস-দাসী ও শ্রমিকদের তা পরিধান করাতে বলেছেন। শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে অথবা কর্ম অনুযায়ী পারিশ্রমিক না দিয়ে পূর্ণ শ্রম আদায় করে নিতে নিষেধ করেছেন। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পূর্ণ পারিশ্রমিক পরিশোধ করতে আদেশ করেছেন। বিভিন্ন অন্যায়ের কাফফারা হিসেবে গোলাম আযাদ করার বিধান মানবতার মুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ সনদ। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে মালিক শ্রমিক নির্বিশেষে সকলকেই আল্লাহর গোলাম হিসেবে প্রমাণ করাই ইসলামের মূল বক্তব্য। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নতুন করে 'মে দিবস' পালন করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ইসলামে দুই ঈদের দিবস, জুমা দিবস, আশুরা দিবস, রমজানের প্রতি রাত, বিশেষ করে শেষ দশকের বিজোড় রাত, জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ দিবসগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা ম্লান করার জন্যই কুফফার শক্তিগুলো নানান দিবসের জন্ম দিয়েছে। পহেলা বৈশাখের পান্তা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা দিবস, ভালোবাসা দিবস, মা দিবস, ব্যক্তি পর্যায়ে জন্ম দিবস, বিবাহ দিবস, মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিবসগুলো তৈরিই করা হয়েছে ইসলামের ঐতিহ্যকে সুক্ষভাবে ধবংস করার জন্য। তাই মুসলিম জাতিকে আবার মাথা উচু করে দাড়াতে হলে বিজাতীয় তাহজিব তামাদ্দুনকে উৎখাত করে নিজস্ব তাহজিব তামাদ্দুন তথা ইসলামের শিক্ষা সাংস্কৃতি ও উৎসবকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মালিক ও শ্রমিক

পৃথিবীর মানুষ আজ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হলো মালিক। আরেক ভাগ হলো শ্রমিক। প্রথম ভাগ শাসক দ্বিতীয় ভাগ শাসিত। প্রথম ভাগ শোষক, দ্বিতীয় ভাগ শোষিত। মালিক যে কাজ করায়, শ্রমিক যে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ে কারো কার্য সম্পাদন করে। মালিকানার আবার

রয়েছে দুটি ধারা। একটি ব্যক্তিগত মালিকানা আরেকটি রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মালিকানা। ব্যক্তিমালিকানা যা মূলত পূজিবাদী অর্থনীতির মূল উৎস। তা ব্যক্তিকে ঢালাওভাবে পূর্ণ স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা দান করে। সে যত সম্পদ উপার্জন করবে তা সবই একান্তভাবে নিজের মালিকানাধীন মনে করে। উপার্জনের এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কারণে একদিকে মালিক পক্ষ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, অপরদিকে শ্রমিক পক্ষ মালিকদের সম্পদ বৃদ্ধির মেশিনে পরিণত হয়েছে। এমনি এক মূহুর্তে আগমণ ঘটে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির। যাদের স্লোগান ছিলো কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। কেউ গাছ তলায়, কেউ দশ তলায়, তা হবে না, তা হবে না। কারো কুকুর খায় খাসা, কারো নেই মাথা গোজার বাসা, তা হবে না, তা হবে না। এজন্য তারা ব্যক্তিমালিকানাকে উৎখাত করে সকল প্রকার কল-কারখানা, জায়গা-জমি ও আয়-উৎপন্নের সকল মালিকানা রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ করার ফর্মূলা পেশ করলো। যেহেতু এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হবে না, তাই জুলুম ও শোষণের কোনো ছিদ্রপথও অবশিষ্ট থাকবে না। এই স্লোগানের মাধ্যমে তারা রাশিয়া, চীন সহ পৃথিবীর বহুদেশে লেলিন, কাল মার্কস ও মাও সেতুং এর শিষ্যরা নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে। কিন্তু পরে দেখা গেলো সম্পূর্ন বিপরীত চিত্র। দেশের কল-কারখানা, জমি-জমাসহ আয়-উৎপন্নের সকল উপকরণের মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতার কাছে কুক্ষিগত হলো। শোষণের ছিদ্রপথ বন্ধ করার নামে দেশের সকল মানুষকে দিন-মজুর আর শ্রমিকে পরিণত করা হলো। এতে একদিকে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হলো। অপর দিকে দেশের আয় উৎপন্ন ব্যহত হতে লাগলো। মানুষ বুঝতে পারলো সমাজতন্ত্রের স্লোগান মাথা-ব্যথা দূর করার জন্য হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাথা কেটে ফেলার সমতুল্য। ১৯৫৪ সনের আগস্ট মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য গৌরমুখ সিংহ রাশিয়া সফর করে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, এখানে কিছুটা উল্লেখ করা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন—

'রাশিয়ার সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দেখলে পাঁচশত রুবেল মজুরির রহস্য বুঝতে পারা যায়। মনে রাখা দরকার যে, একটি রুবেলের মূল্য আমাদের দেশি টাকা অনুসারে ১,০৯ টাকা মাত্র, কিন্তু সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদীর মূল্য নিম্নরূপ— একটি ডিমের মূল্য ৩ রুবেল, একটি মোরগের মূল্য ২৫ রুবেল, টমেটোর প্রতি কেজি মূল্য ২ রুবেল, দুধ প্রতি কেজি মূল্য ২০ রুবেল, আলুর প্রতি সের মূল্য ৬ রুবেল, মূলার প্রতি কেজি মূল্য ৫ রুবেল, গাজর প্রতি কেজি মূল্য ৮ রুবেল। শালগমের প্রতি কেজি মূল্য ৭ রুবেল, ডবল রুটির প্রত্যেকটির মূল্য ২ রুবেল, বকরির গোশত প্রতি সের মূল্য ১৮ রুবেল, ৬ সিট কাগজের মূল্য ৪ রুবেল, একটি শিতল কোর্তার মূল্য ৪ রুবেল, গমের এক মণ মূল্য ৮৫ রুবেল, মেয়েদের ছোট ব্যাগ প্রতিটি ৯০ রুবেল। এখানে শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিসের মূল্যের উল্লেখ করা হলো। এ হতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেখানে একজন মজুর পাঁচশত রুবেল বেতন পাইলেও তাহার জীবনযাত্রা মোটেই সচ্ছল হতে পারে না। আর কেবল রাশিয়াই নয়, প্রতিটি কমিউনিষ্ট দেশেরই এ অবস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের তরফ হতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক ইশতেহার হতে এসব দেশের শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তাতে স্পষ্ট স্বীকার করা হয়েছে যে, 'চোকোস্লোভাকিয়ার মজদুরদের দ্বারা ক্রীতদাসদের ন্যায় কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত ভয়ানক পদ্ধতি। রাশিয়ার আইনে রাজনৈতিক সন্দেহসূত্রে শ্রমিকদেরকে বাধ্যতামূলক দাস শ্রমিকদের ক্যাম্পে বন্দি করে রাখার সুযোগ রয়েছে।

অতঃপর চীনের মজুর শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কেও খানিকটা আলোচনা করতে চেষ্টা করব। কেননা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর কমিউনিষ্ট প্রচারক আজকাল কথায় কথায় চীন দেশের দোহাই দিয়ে থাকেন।

১৯৫৯ সনে এপ্রিল মাসে 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্কাস ডেলিগেশন' এর সদস্য হিসাবে ব্রজকিশোর শাস্ত্র সরকারি আমন্ত্রণে চীন গমন করে। সেখানে তিনি মজুর-শ্রমিকদের অবস্থা জানবার জন্য বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করেন। প্রায় ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করে তিনি সেখানকার মজুর-শ্রমিকদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন, তা নিম্নরূপ—

'এখানে আমরা হালের সঙ্গে বলদের পরিবর্তে মেয়েদেরকে বাঁধা দেখেছি। সে কত মর্মান্তিক ও অমানুষিক দৃশ্য।'

চীনের ইংয়াস্টেরি ভারপ্রোজেক্ট এ সব মজুর শ্রমিককে তিনি কাজ করতে দেখেছেন, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন—

'এই প্রোজেক্ট- এর নিকটে অফিসারদের থাকবার বাঙলো নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর এখানে কাজ করে। সকল প্রকার পাথরভাঙা হতে শুরু করে সুড়ঙ্গ খোদাই করা কিংবা পাথরের চটান স্থানান্তরিত করা, প্রভৃতি যাবতীয় কাজই অনাবৃত হাতে করা হয়েছে। মজুররা যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করছিলো, তা ছিল খুবই দুর্বল ও প্রায় অকেজো এবং নিকৃষ্ট ধরনের। মনে হচ্ছিলো যে, তা কোনো যাদুঘর হতে আনা হয়েছে।

তিনি বলেন— 'আমি এই দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য হতচেতন হয়ো পড়লাম। চীন দেশের মেহনতি লোকদের দিয়ে যেভাবে কাজ করানো হচ্ছে তা দেখে তার অনুকরণ করা বা তা হতে কোনো প্রকার প্রেরণা লাভ তো দূরের কথা; বরং বড়ই দু:খ ও বেদনা পেলাম। আমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। মানুষ আর যাই হোক জন্তু নয়। কোনো দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে জন্তুদের স্থানে মানুষকে ব্যবহার করা মানবতার উপর নির্মম জুলুম ও চরম অমানুষিকতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

এর প্রতিবাদ করারও ভাষা নেই। মজুরদের বেশির ভাগ বহু দূর-দূরাঞ্চল হতে আনা হয়েছে। বর্তমান চাকরি

ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার তাদের কোনো পথ নেই। মূলত চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও প্রেসিডেন্ট মাওসেতুঙ এখানে বাধ্যতামূলক অমানুষিক শ্রমের রাশিয়ার পরীক্ষিত 'কার্যপদ্ধতি' প্রয়োগ করেছেন।

মানুষ যখন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো, তখন বড় বড় কম্যুনিস্ট দেশগুলোর রাস্তা থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিশাল আকারের মূর্তিগুলো ক্রেন দিয়ে টেনে সাগরে ফেলে দেয়া হয়। অবশ্য বাংলাদেশে কিছু খুচরা কম্যুনিস্টদের উৎপাত নতুন করে বেড়ে গেছে। সাগরে ভাটা লাগলেও তারা খালে জোয়ার আনার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এজন্য তারা এদেশের সরল সহজ শ্রমিক ভাই-বোনদের নানা রকম শ্রমিক সংগঠন তৈরি করে নিজেদের পক্ষে টানার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানে নারী শ্রমিকদের ইসলামের বিপক্ষে দাঁড় করানোর জন্য ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইসলামের শ্রমনীতি ও শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে জাতিকে সচেতন করা ঈমানী দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা

ইসলাম মানুষকে শ্রমে উৎসাহিত করে। অলস জীবন-যাপন করা ইসলাম সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْـأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَـثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।' (সুরা জুমুআ, ৬২ : ১০)

রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صـلى الله عليه وسلم– : طَلَبُ كَسْبِ الْحَـلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

'অন্যান্য ফরজের পরে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হলো, হালাল উপার্জন করা।' (বায়হাকী, ১২০৩০), মেশকাত (২৭৮১)

রাসূল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ منْ كَسْبِكُمْ

'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম খাদ্য হলো নিজ উপার্জন থেকে ভক্ষণ করা।' (মুসনাদে আহমাদ ২৫২৯৬, তিরমিযি ১৩৫৮, আবু দাউদ ৩৫৩০, নাসায়ী ৪৪৬১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بتَمْرَةٍ منْ كَسْب طَيِّبٍ إِلاَّ أَخَذَهَا اللَّـهُ بيَمينـه فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَـهُ حَتَّى تَكُونَ مثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ

'উত্তম উপার্জন থেকে যদি একটি খেজুরও সদাকাহ করা হয় তা অবশ্যই আল্লাহ (সুব.) নিজ হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা লালন-পালন করেন যেমনিভাবে একজন মানুষ বকরির বাচ্চা অথবা উটের বাচ্চাকে লালন পালন করে। এক পর্যায়ে তা পাহাড়ের ন্যায় বা তার চেয়ে বড় আকার ধারন করে' (মুসলিম ২৩৯০)

হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে–

عَنْ جَدِّه رَافِعِ بْن خَديجٍ قَالَ قيلَ يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُـلِ بيَده

'রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো- 'সব চেয়ে উত্তম উপার্জন কোনটি?' তিনি উত্তর দিলেন- 'সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হলো মানুষের নিজের হাতের কামাই।' (মুসনাদে আহমাদ ১৭২৬৫)

শ্রমিকের মর্যাদা

শ্রমিকদের আল্লাহ (সুব.) ভালোবাসেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

إنّ الله تعالى يُحبُّ العَبْدَ المُؤْمنَ المُحْتَرفَ

'নিশ্চয় আল্লাহ (সুব.) শিল্প উদ্যোক্তা মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন।' (আল ফাতহুল কাবীর ৩৫৭২, আল জামেউস সগীর ১৮৭৩, কানযুল উম্মাল ৯১৯৯)

নবী-রাসূল ও সাহাবাদের অনেকেই শ্রমজীবি ছিলেন, গদ্দীনাশিন নন

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) অন্যের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করেছেন। খাদিজা (রা.) এর ব্যবসা পরিচালনার কথা কে না জানে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবাদেরও অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার অনেকেই শ্রমজীবি ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। বরং মর্যাদা নির্ণয় হতো তাকওয়ার ভিত্তিতে। যা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।' (সুরা হুজরাত, ১৩ : ৪৯)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَصَابَ نَبِـىَّ اللَّـه – صلى الله عليه وسلم– خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذَلكَ عَليًّا رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَلْتَمسُ عَمَـلاً ليُصيبَ فيه شَيْئًا يَبْعَثُ به إِلَى نَبِىِّ اللَّـه – صلى الله عليه وسلم– فَأَتَى بُسْتَانًا لرَجُـلٍ منَ الْيَهُود فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُودىُّ منْ تَمْره سَـبْعَةَ عَشْرَ تَمْرَةً عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِىِّ اللَّه – صلى الله عليه وسلم

'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– 'একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্ষুধাগ্রস্থ হলেন। আলী (রা.) বিষয়টি জানতে পেরে কাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন যাতে কিছু খাদ্য উপার্জন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট পাঠানো যায়। তিনি এক ইয়াহুদীর বাগানে গেলেন। সতের বালতি পানি বাগানে দিলেন। প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একেকটি খেজুর মজুরি নির্ধারণ করার শর্তে। সতেরো বালতি পানি বাগানে ঢালার পরে ইয়াহুদী তাকে ১৭টি আজওয়া খেজুর নির্বাচন করার জন্য স্বাধীনতা দিলেন। আলী (রা.) সেগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে চলে আসলেন।.....'(বায়হাকী ১১৯৮৩,

ইত্তেহাফুল খিয়ারাহ আল মাহরাহ ৭৩৩৮)

অন্যান্য নবী রাসুলদেরও অনেকেই শ্রমজীবি ছিলেন। দাউদ (আ.) সম্পর্কে হাদিসে বর্নিত হয়েছে–

عن أبي هريرة رضي الله عنـــه قـــال قـــال رسول الله صلى الله عليه و سلم ٩ كـــان داود عليه السلام لا يأكل إلا من كـــسب يده

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– 'রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, দাউদ (আ.) নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কোনো কিছুই খেতেন না।' (আল মু'জামুস সগীর ১৭, কানযুল উম্মাল ৯২১৯, ৯২২২, আল মু'জামূল কাবীর১২০৫)

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরি পরিশোধ করা

শ্রমিকের পাওনা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কমবেশি সব ধর্মের কিতাবেই কিছু না কিছু উল্লেখ আছে। তবে ইসলাম যেভাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে এসব বিষয়ে কথা বলেছে, সেভাবে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা অন্য কোনো বই-পুস্তকে পাওয়া যায় না। শ্রমিক তার কাজ সম্পাদন করলে অনতিবিলম্বে পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا :« أَعْطُوا الأَجِـيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَأَعْلِمْـهُ أَجْـرَهُ وَهُوَ فِى عَمَلِه

'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তোমরা তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।' (বায়হাকী ১১৯৯৪, আল ইত্তেহাফ ২৯৪১, মেশকাত ২৯৮৭,)

নিয়োগের পূর্বেই বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা

কোনো শ্রমিক থেকে কোনো কাজ নেয়ার পূর্বেই তার শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে নেয়ার প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। অনেককে দেখা যায় রিকশা বা অন্য কোনো বাহনে ভাড়া নির্ধারণ না করেই উঠে যায়। আর পরবর্তিতে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে। এটি একেবারেই গর্হিত কাজ। এ কারণেই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّـــى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রমের মূল্য নির্ধারণ না করে শ্রমিক নিয়োগ করা থেকে বারণ করেছেন।' (মুসনাদে আহমাদ ১১৫৬৫, ১১৬৭৬, ১১৫৮২, বায়হাকী ১১৯৮৬)

তবে যদি কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণ করা থাকে অথবা সাধারণত যে পরিমাণ ভাড়া হতে পারে তার চেয়ে একটু বেশি দেয়ার খেয়াল থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

বেতন নিয়ে টাল বাহানা করা

বেতন নির্ধারণ করার পরে শ্রমিক যখন তার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে, তখন মালিকের দায়িত্ব হলো; অনতিবিলম্বে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা। বর্তমান যুগে অধিকাংশ কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিদার শ্রমিক-মজুরদের প্রতি অশুভ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে থাকে। তারা মজুর-শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করে তিলে তিলে তার কাজ আদায় করে নেয়। অথচ তাদের যথেষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয় না। আবার অনেক সময় দিলেও নানান ফাঁদে ও কৌশলে অথবা প্রতারণা করে অধিকাংশ কেটে-ছেটে রেখে দেয়। তারপরও যে সামান্য পরিমাণ বেতন বা মজুরি প্রাপ্য হয় তাও যথা সময়ে আদায় করতে কুণ্ঠাবোধ করে। অফিসের নিয়ম-নীতির অজুহাতে অথবা মালিকের ব্যস্ততার অজুহাতে বেতন দিতে ইচ্ছাপূর্বক বিলম্ব করা হয়। মজুর-শ্রমিকরা যখন তাদের শিশু-সন্তানকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, অসুখ-বিসুখে, শীতে-গরমে অতিষ্ঠ দেখে মালিকের কাছে পাওনা পারিশ্রমিক দাবি করতে যায় তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আকাশ-চুম্বি প্রাসাদের বিলাসবহুল অফিস থেকে হুঙ্কার ছাড়া হয়, 'এখন দিতে পারব না। এক সপ্তাহ পরে এসো।' আর শ্রমিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে তাহলে নিজেদের পালিত সন্ত্রাসী ও লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তা না পারলে দাঙা পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করা হয়। মালিক ও পুঁজিদারদের এ ধরনের আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচারমূলক। রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـــولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

'সামর্থবান মালিক বা পুঁজিদারের টাল-বাহানা অবশ্যই অন্যায় ও জুলুম।' (বুখারি ২২৮৭, ২৪০০, ২২৮৮, মুসলিম ৪০৮৫, তিরমিযি ১৩০৯, আবু দাউদ ৩৩৪৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَـــنْ النَّبِـــيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة رَجُلٌ أَعْطَى بِـــي ثُـــمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَـــهُ وَرَجُـــلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

'আল্লাহ (সুব.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে আমি নিজেই প্রতিপক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নেবো।

১. যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাউকে কিছু দান করার ওয়াদা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

২. যে ব্যক্তি কোনো মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করে।

৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক বা কর্মচারি নিয়োগ করে যথাযথভাবে কাজ আদায় করে নিয়ে তার মজুরি পরিশোধ করে না।' (বুখারী ২২২৭ ২২২৮, ২২৭০, ইবনে মাজাহ ২৪৪২, মুসনাদে আহমাদ ৮৬৯২, বায়হাকী ১১৩৭৬, মেশকাত ২৯৮৪)

শ্রমিকদের বেতন ছাড়াও তার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু হতে তাকে কিছু দিবে

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিককে শুধু বেতন-ভাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া উচিত নয়। বরং তার

মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য, খাদ্য, পোষাক ইতাদি থেকে কিছু অংশ প্রদান করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِى يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ

‘তোমাদের ভৃত্য যখন তোমার খাদ্য প্রস্তুত করে তোমার নিকট পরিবেশন করে, তখন তুমি তাকে তোমার সঙ্গে বসাও এবং তার মাধ্যমে তৈরিকৃত খাবারের কিছু অংশ তাকে খেতে দাও। খাবার যদি শুকনো হয় তবে তা হতে এক লোকমা বা দু লোকমা তার মুঠে তুলে দাও। কেননা আগুনের তাপ এবং ধোয়ার কষ্ট সে ই ভোগ করেছে।’ (মুসলিম ৪৪০৭)

রসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَكُمْ وَإِلَّا فَلَقِّمُوهُ فِي يَدِهِ

‘যখন তোমাদের পাঁচক তোমাদের কাছে খাবার নিয়ে আসে তখন তাকে ডেকে তোমাদের সঙ্গে খেতে দাও। তা না হলে খাবারের কিছু অংশ তার হাতে তুলে দাও।’ (মুসনাদে আহমাদ:৮১৯৬)

বর্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য ও বিত্তবান লোকদের সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা তাদের খাদ্য থেকে ভৃত্য ও কাজের বুয়াকে খাদ্য দেয়া তো দূরের কথা, তাদের জন্য আলাদা খাবার তৈরি করা হয়। এমনকি নিজেরা উন্নতমানের চাল খেলেও বাবুর্চি ও গৃহ পরিচারিকাদের জন্য নিম্নমানের আলাদা চাল ক্রয় করা হয়। ইসলাম এ ধরনের আচরণকে চরমভাবে ঘৃণা ও প্রত্যখান করে। এ হাদিসে শুধু খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আরো ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। যারা মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করে তাদেরকে বেতন ছাড়াও নীট মুনাফা হতে কিছু অংশ প্রদান করা উচিত। গার্মেন্টস শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে মানুষের জন্য পোষাক তৈরি করে, অথচ তার নিজের বা তার পরিবারের সদস্যদের ভালো কেনো পোষাক নেই। তাঁত শ্রমিক সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে থান কে থান কাপড় তৈরি করে। অথচ তার নিজের বা তার পরিবারের লোকদের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্রটুকুও জোটে না। ইসলামের শ্রমনীতি কায়েম হলে এ অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবকাশ থাকতে পারবে না। কারখানার মালিক তার কুকুরকে পর্যন্ত মখমলের মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত করবে আর যে শ্রমিক কাপড় তৈরি করলো, সে উলঙ্গ থাকবে, তা ইসলাম কখনো বরদাশত করে না।

ইসলামে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাই ভাই। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

‘মারুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু যর গিফারী (রা.) এর সাথে রাবাযা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তার নিজের এবং তার কৃতদাসের শরিরে একই ধরনের পোষাক দেখতে পেলাম। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন– আমি একদা একজন মানুষকে (কৃতদাসকে) তার মা তুলে গালি দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন– ‘হে আবু যর! তুমি তাকে তার মা তুলে গালি দিলে? নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এখনো জাহেলি যুগের চরিত্র রয়ে গেছে। তোমাদের অধিনস্থ শ্রমিক ও কর্মচারী তোমাদের ভাই। আল্লাহ (সুব.) তাদেরকে তোমাদের অধিনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের যার অধিনে অপর কোনো ভাই থাকবে তাকে তা-ই খেতে দিবে, যা নিজে খাও এবং তাই পরিধাণ করতে দিবে যা নিজে পরিধাণ করো। তাদেরকে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দিবে না। যদি এরকম কোনো কাজ দিতেই হয়, সেক্ষেত্রে তাকে তোমরা সাহায্য করো।’ (নিজে সহযোগীতা করে অথবা প্রয়োজনীয় আরো বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে)’। (বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০, মুসলিম ৪৪০৩, ৪৪০৫, তিরমিযি ১৯৪৫, আবু দাউদ ৫১৬০)

এই হাদিস থেকে শিক্ষা

ক. মালিক শ্রমিক পরস্পর ভাই। দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সে সম্পর্কই থাকবে।

খ. মালিক ও শ্রমিক খাওয়া-পরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

গ. সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দিবে না।

ঘ. যদি সামর্থের বাইরে কোনো কাজ দিতে হয় সেক্ষেত্রে আরো সহযোগি দিতে হবে।

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ

‘অধীস্থ শ্রমিক-কর্মচারির খাদ্য-বস্ত্রের অধিকার রয়েছে। তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না।’ (মুসলিম ৪৪০৬, আবু দাউদ ৫১৬০, আল মুয়াত্তা ১৭৬৯, মুসনাদে আহমাদ ৭৩৬৪)

শ্রমিকের কর্তব্য

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিদারের ব্যপারে ইসলামে শ্রমনীতি বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করলাম। এবারে আমরা শ্রমিকদের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা পেশ করবো।

চুক্তি মোতাবেক কাজ করা

একজন শ্রমিকের প্রধান দায়িত্ব কর্তব্য হলো চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত

কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

إنّ الله تعالى يُحِبُّ منَ العامِلِ إذا عَمِلَ أنْ يُحْسِنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনকারী শ্রমিককে ভালোবাসেন।' (আল ফাতহুল কাবীর ৩৬০১, ১৪৩৬৯, আল মু'জামূল কাবীর ৪৪৮, বায়হাকী শু'আবুল ঈমান ৫৩১৫)

আল্লাহর হক ও মালিকের হক উভয়টির প্রতি খেয়াল রাখা

কোনো মাখলুকের আনুগত্য করতে গিয়ে খালেকের অবাধ্য হওয়া যাবে না। অন্য কথায় আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো মানুষের হুকুম পালন করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম ঠিক রেখে মালিকের হুকুম যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে আমানাতের খেয়ানত না করা। কোনো কোনো শ্রমিক কর্মকর্তা, কর্মচারী মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করে থাকে। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এজন্য অবশ্যই তাকে কিয়ামতের মাঠে বিচারের সম্মুখিন হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি শ্রমিক তার উপর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে তাহলে তার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَـــقَّ مَوَاليه

'তিন শ্রেণীর মানুষকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তার মধ্যে এক শ্রেণী হলো, ঐ শ্রমিক যে আল্লাহর হক আদায় করে ও নিজের মালিকের হক আদায় করে।' (বুখারী ৯৭, মেশকাত:১১, আল আদাবুল মুফরাত ৫৩, আল জামে বাইনাস সহীহাইন ৪২৮, রিয়াদুস সালিহীন ১৩৬৫)

হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُــولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لِلْعَبْد الْمَمْلُــوك الصَّالح أَجْرَان وَالَّذي نَفْسي بِيَــده لَوْلَــا الْجهَادُ في سَبِيل اللَّه وَالْحَجُّ وَبِـرُّ أُمِّــي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন সৎ শ্রমিকের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। (অত:পর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন) ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের প্রতি সৎ ব্যবহারের বিষয়গুলো না থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি শ্রমিক হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে পছন্দ করতাম।' (বুখারী ২৫৪৮, আল ফাতহুল কাবীর ৯৮৭৮, ফাতহুল বারী ১২৭, কানযুল উম্মাল ২৫১১৪, মুসনাদে বায্যার ৭৭৪৯)

মালিকের সম্পদ সংরক্ষণ করা

মালিকের জিনিসপত্র ভাঙচুর বা ধবংস না করে যথাযথভাবে হেফাজত করা। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ হয় সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি যত্নবাণ হওয়া খুবই জরুরি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ – إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ – فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

'যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত, শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। অতএব তারা যেনো এ গৃহের রবের ইবাদত করে।' (সুরা কুরাইশ ১০৬ : ১-৩)

এ আয়াতে কুরাইশদেরকে বলা হয়েছে যেই ঘরের কারণে তাদের শিতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ব্যবসায়িক সফরের সুবিধা রয়েছে, যে ঘরের কারণে তাদেরকে পৃথিবীর মানুষ সম্মান করে এবং নিরাপত্তা দেয়। সেই ঘরের রবের ইবাদত করতে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই শ্রমিকদেরও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

সাধারণ শ্রমিকদের কোনো কাজে বাধ্য না করা

শ্রমিক দিবসে সাধারণ শ্রমিকদের কাজে যোগদান করা থেকে জোরপূর্বক বাঁধা প্রদান না করা, রাজনৈতিক সমাবেশে লোক সমাগমের জন্য গার্মেন্টস ও কল-কারখানার শ্রমিকদের জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা, এগুলো শ্রমিক আইনের পরিপন্থি।

রাস্তা অবরোধ ও গাড়ি ভাঙচুর না করা

কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো সমস্যার কারণে রাস্তা অবরোধ করা, সাধারণ মানুষকে হয়রানী করা, গাড়ি ভাঙচুর করে মানুষের জানমালের ক্ষতি করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। তবে ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য দাবি-দাওয়া পেশ করা, মিছিল, মিটিং বা সমাবেশ করা অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অফিস ঘেরাও করা যেতে পারে।

সহশ্রম বন্ধ করা

নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের সাথে সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে তাদের জন্য আলাদা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিমদের করণীয়

ক. ইসলামের শ্রমনীতি সম্পর্কে শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা।

খ. ইসলামিক শ্রমিক সংগঠন তৈরি করা। যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী সমাবেশ করতে না পারে।

গ. বিভিন্ন কল-কারখানা, গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরী, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করা। এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ঘ. নারী-পুরুষের জন্য সতন্ত্র কর্মক্ষেত্র তৈরি করে সমালোচকদের বাস্তব সম্মত জবাব দেয়া।

ঙ. দক্ষ কারীগর ও শ্রমিক তৈরি করার জন্য কারীগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

চ. আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করার জন্য তাজমহল ও বড় বড় দরগা-মাজার তৈরি করার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কোচিং সেন্টার ও ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।

এভাবেই বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। শুধু সমালোচনা করেই নাস্তিক-মুরতাদদের মোকাবেলা করা যাবে না। মানুষ যখন

তৃষ্ণায় হাহাকার করছে তখন আপনি একমাত্র পানির কূপটির সামনে দাড়িয়ে ঐ কূপের দূষিত পানি পান না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। পিপাসায় কাতর লোকেরা আপনার কাছে বিকল্প বিশুদ্ধ পানির আবেদন করলো। আপনি বললেন– না, আমার কাছে বিশুদ্ধ পানি নেই। তবে এই কূপের দূষিত পানি পান করতে দেয়া হবে না। তখন আস্তে আস্তে জড়ো হওয়া তৃষ্ণার্ত লোকেরা আপনাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে ঐ নষ্ট পানিই পান করবে। বর্তমানে আমরা মুসলিমরা তাই করছি। আমরা মুসলিমরা কবর আর মাজার তৈরি করছি, আর ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানরা নটরডেম কলেজ, যোসেফ স্কুল ইত্যাদি তৈরি করছে। আর এদেশের হাজি সাহেবরা ভালো লেখাপড়ার জন্য তাদের আদরের সন্তানদের খ্রীষ্টান স্কুলে ভর্তি করিয়ে ঈমানহারা নাস্তিক-মুরতাদ বানাচ্ছে। মুসলিম জাতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে তাদেরকে মুরীদ বানিয়ে হাদিয়া তোহফার নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর নাস্তিক-মুরতাদরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ লক্ষ সরল, সহজ নারী-পুরুষকে নাস্তিকতা শিক্ষা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে। আমরা বিপদ-আপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তে সমবেদনা প্রকাশ করি ও চোখের পানি ঝরাই। আর কাফের-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদরা খাদ্য-পানি, ঔষধপত্রসহ সাহায্য নিয়ে দাঁড়ায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কাজগুলোই আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

فَوَاللَّه لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّـــه إِنَّـــكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِـــلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الـــضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

'যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) গারে হেরা থেকে অহিপ্রাপ্ত হয়ে খাদিজা (রা.) এর কাছে এসে নিজের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। তখন খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দিয়ে বললেন– 'আল্লাহর কসম! আপনাকে আল্লাহ (সুব.) কখনো অপমান করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় মানুষদের বোঝা বহন করেন, অন্নহীন-বস্ত্রহীন মানুষদের সাহায্য করেন, পথিক-মুসাফির ও আগন্তুক মেহমানদের মেহমানদারী করেন, দুর্যোগ মুহূর্তে মানুষকে সাহায্য করেন। আর এই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যাদের থাকে তারা কখনোই অপমানিত হয় না।' (বুখারি ৩, ৪৯৫৩, ৬৯৮২, মুসলিম ৪২২, মুসনাদে আহমাদ ২৫৯৫৯, বায়হাকী ১৮১৭৭, মেশকাত ৫৮৪১)

তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী উপরোক্ত কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসি। আল্লাহ (সুব.) আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

নকীব মাহমুদ –এর দু'টি কবিতা

দেশ ছেড়ে সব যা

বামপন্থি রামপন্থি
খেকশিয়ালে ছা
আমরা খালিদ, জেগে আছি
দেশ ছেড়ে সব যা।

ডাকুক না তোরে

ডাকুক না লোকে তোরে জঙ্গি
কোরআনই হোক তোর সঙ্গি
কোরআনই হোক তোর মন্ত্র
ছুড়ে ফেল মিছে গণতন্ত্র।

জানার আছে অনেক কিছু
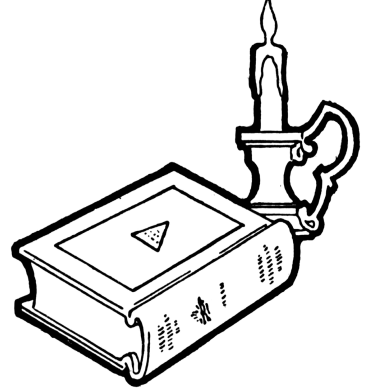
পানির তলায় মাটি কাটার যন্ত্রের নাম- ড্রেডলার।

বধির লোকদের শোনার সাহায্যকারী যন্ত্র- ইয়ার ট্রাম্পেট ।

জিওলজি (Geology)হল- ভূ-তত্ত্ববিদ্যা।

জুওলজি (Zoology)হল- প্রাণীবিদ্যা।

বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ দেশ- ইন্দোনেশিয়া।

'ক্যাম্প নামা' কোন দেশের কারাগার- ইরাক।

'এক দেশ দুই পদ্ধতি নীতি' চালু- চীনে।

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়- মিশরীয়দেরকে।

আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়- দানিয়ুব নদীকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১৯১৪ সালে ।

বি-৫২ কি?
এক ধরনের বোমারু বিমান।

সারা দেশে নিবন্ধিত কৃষকের সংখ্যা- এক কোটি ৮০ লাখ ।

বাংলাদেশের সবচেয়ে উওরের জেলা- পঞ্চগড় ।

বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন- সেন্টমার্টিন।

বাংলা ভাষা কোন শব্দ দুইটি গ্রহণ করেছে চিনা ভাষা থেকে- চা, চিনি

নারী অধিকার ও নারী নির্যাতনের তীর্থভূমি

মাসুমুর রহমান খলিলী

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে ইসলামকে একটি বড় বাধা হিসাবে তুলে ধরার পশ্চিমা গণমাধ্যমের প্রচার প্রচারণা যখন তুঙ্গে তখন বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত ভারত নারী অধিকার হরণ ও নারী নির্যাতনের তীর্থ ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পশ্চিমের অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মূল্যবোধের সাথে ভারতীয় সমাজের মুক্ত জীবনের কামনা এক হয়ে এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে যাতে দেশটির রাজধানীতে রাতে তো নয়ই দিনেও নারীরা নিরাপদ থাকছে না। দিল্লীর বাসযাত্রী চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার পর এ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলন ও নারী অধিকার হরণ ও ধর্ষণ একসাথে চলতে থাকে। আসামের গোহাটিতে ধর্ষণের ঘটনা চাপা পড়তে না পড়তে রাজধানীতে ঘটে শিশু ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা। ধর্ষিতা হয়ে আত্মহননের ঘটনা ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে একটি নিত্যবিষয়। আসামের গোহাটিতে এক ছাত্রীকে ১৮ জনের এক দুর্বৃত্ত দল গণধর্ষণ করে মদের দোকানে ফেলে রেখে যায়। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ১৯৬৬ সালেই একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ক'দিন আগেও দেশটির রাষ্ট্রপ্রধানের পদে ছিলেন একজন নারী। লোকসভায় বিরোধী দলের নেত্রী এখন একজন নারী। সরকারি জোট ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ এলায়েন্সের প্রধানও একজন নারী- যাকে মনমোহন সরকারের প্রকৃত নীতি নির্ধারক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এতোকিছুর পরও কেন ভারত বিশ্বের শিল্পোন্নত ও বৃহত্তম ২০ অর্থনীতির দেশের মধ্যে সবচেয়ে অনিরাপদ জনপদের স্বীকৃতি পেল নারীদের জন্য? সম্প্রতি বিশ্বের ৩৭০ জন জেন্ডার বিশেষজ্ঞের মধ্যে এক জরীপ অনুষ্ঠিত হয়- তারাই বলেছেন ভারতই হলো নারীদের জন্য জি ২০ দেশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে অনিরাপদ রাষ্ট্র। ভারতে নারী ও মেয়েরা ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তির মত বিক্রি হয়। ১০ বছর বয়সেই দেশটিতে বিয়ে হবার ঘটনা ঘটে। যৌতুকের জন্য জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটে দেশটিতে। গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত তরুণী মেয়েদের হয়রানি করা সেখানে নিত্য বিষয়। এসব কথা ভারতীয় সমাজকে পর্যবেক্ষণের পর বলেছেন 'সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউকে হেলথ প্রোগ্রাম ডেভলপমেন্ট' এডভাইজার গুলশান রেহমান। তার এ বক্তব্য কতটা অকাট্য তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কিছু পরিসংখ্যান সামনে রাখা হলে। আফ্রিকায় কঙ্গো নামের একটি অরাজক ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ রয়েছে। সে দেশে ধর্ষণের যে রেকর্ড রয়েছে তাকে হার

'তালেবান শাসনে মেয়েদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। তালেবানরা কি পছন্দ করে বা না করে তার মধ্যে গোপনীয়তার কিছু নেই। কিন্তু এখানকার অবস্থা হলো বর্ণচোরা। আমরা মেয়েদের মহত্ত্বের কথা বলি আর বাস্তবে তাদের ভয়াবহ নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হই। অধিকন্তু এসবের জন্য দোষারোপ করি আবার তাদেরকে।'

মানিয়েছে ভারত। ৪ লাখ মেয়ে প্রতি বছর ধর্ষিতা হয় ভারতে। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন উইম্যান (২০১০) এর মতে ৪৫ শতাংশ ভারতীয় মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছরের কম বয়সে। ইউএন পপুলেশন ফান্ডের তথ্য অনুসারে ২০১০ সালে ৫৬ হাজার মাতৃমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ভারতে। সেখানকার ৫২ শতাংশ বয়সন্ধির মেয়ে মনে করে পুরুষ মানুষ তার স্ত্রীকে পেটাবে-এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। নারী নির্যাতনের ঘটনা যে দেশটিতে কতটা বাড়ছে তা সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে। ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ভারতে ৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ২৮ হাজার ৬৫০টিতে পৌছেছে। এর মধ্যে ২৭.৭ শতাংশ মামলা রেকর্ড হয়েছে যৌতুকের জন্য নির্যাতন সংক্রান্ত, ১৯.৪ শতাংশ অপহরণ ও গুম বিষয়ক আর ৯.২ শতাংশ হলো ধর্ষণের মামলা। রেকর্ডের বাইরেও এ ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটে ভারতে, যা উপরের পরিসংখ্যানের চেয়ে আরো অনেক বেশি।

ভারতীয় সমাজের এর চেয়েও ভয়ানক চিত্র হলো নারী শিশুর ভ্রুন হত্যার ঘটনা। সেখানকার দরিদ্র মানুষ যৌতুকের আতঙ্কে মেয়ে শিশুর পরিবর্তে ছেলে সন্তানকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে গত তিন দশকে ১ কোটি ২০ লাখ নারী শিশুকে গর্ভে থাকতে হত্যা করেছে। এ প্রবণতার কারণে ভারতে এখন পুরুষের তুলনায় নারী জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। ভারতে নারীদের অবস্থা প্রসঙ্গে আসামে মেয়েদের সাময়িকী 'নন্দিনী' সম্পাদিকা মাইনি মহান্তের মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তার মতে, 'তালেবান শাসনে মেয়েদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। তালেবানরা কি পছন্দ করে বা না করে তার মধ্যে গোপনীয়তার কিছু নেই। কিন্তু এখানকার অবস্থা হলো বর্ণচোরা। আমরা মেয়েদের মহত্বের কথা বলি আর বাস্তবে তাদের ভয়াবহ নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হই। অধিকন্তু এসবের জন্য দোষারোপ করি আবার তাদেরকে।'

ভারতের সমাজে এতটা দুরাবস্থা কেন তার মূল অনুসন্ধানে আরো মারাত্মক চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় দেশটির শীর্ষ পর্যায়ের সাময়িকী আউটলুক ইন্ডিয়ার ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে প্রকাশিত এক জরীপে। ভারতের শহরগুলোর ৩০ শতাংশ তরুণ-তরুণী মনে করে সমকামিতায় দোষের কিছু নেই। ৭৩ শতাংশ মনে করে বিয়ে নিষিদ্ধ এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিতদের মধ্যকার অনাকাঙ্খিত সম্পর্ক ভারতীয় সমাজের জন্য একটি বড় সমস্যা। জরিপ অনুসারে ভারতীয় ৭০ শতাংশের বেশী মানুষ স্বামী-স্ত্রীর বাইরে বিশেষ সম্পর্কে অভ্যস্ত। ৫৩.৮ শতাংশ জানিয়েছে তারা বিয়ে ছাড়া একসাথে বসবাসকে সমর্থন করে। এ রকম আরো অনেক জরীপে ভারতের সমাজের ভেতরের পরিস্থিতি যে কত ভয়াবহ তার প্রকাশ দেখা যায়।

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসারে মেয়েরা পিতা বা স্বামীর কোনো ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। বিয়ের সময় পিতার পক্ষ থেকে যৌতুক হিসাবে যা দেয়া হয় সেটিই কন্যার চূড়ান্ত দায় হিসাবে গণ্য করা হয়। ফলে সংসারে কোনো অশান্তি দেখা দিলে চরম নিগ্রহের মধ্যে পড়ে ভারতের বিশেষভাবে দরিদ্র নারীরা। এজন্য নারী আত্মহননের ঘটনা অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ভারতে অনেক বেশি। ভারতীয় সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণের যে প্রথা ছিল তা বৃটিশ শাসনের সময় আইন করে তুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো দেশটির অনেক স্থানে এ প্রথা অঘোষিতভাবে অনুসরণ করা হয়। ভারতের অনেক স্থানে ধর্মীয় উপাসনালয়ে সেবাদাসী প্রথা চালু রয়েছে। সেখানে মেয়েরা মন্দিরের সেবায়েতদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য নিজেদের সমপর্ণ করে, আর সেটিকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতীয় সমাজে নারী নিগ্রহের এই পরিস্থিতির পেছনে দেশটির সামাজিক ও ধর্মীয় কিছু বিকৃত বিধান যেমন দায়ী তেমনিভাবে পাশ্চাত্যের মুক্ত সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবও এর পেছনে কাজ করেছে। আউটলুকের যে জরীপের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এমন অনেক তথ্যও রয়েছে যা প্রকাশ শোভন হবে না বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সবের পেছনে পশ্চিম-বিশেষত ইউরোপের উন্মুক্ত সংস্কৃতির প্রভাব দায়ী। পাশ্চাত্যের সমাজে নারীদের আইনী অধিকার ও জীবীকার সুযোগ অনেক বেশি থাকায় সেখানে মেয়েদের নিরাপত্তা ভারতের মত ততটা ভঙ্গুর নয়। তবে ধর্ষণ নারী নিগ্রহ সেখানকার সমাজেও নিত্যই ঘটে থাকে। নারী অধিকার সম্পর্কে এক ধরনের বিকৃত প্রচারণা তাসলিমা নাসরিনের মত বিকৃত রুচির নারীবাদীরা করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হলো নারী তার শারিরীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীন। এ স্বাধীনতা শিশুকে আগুনে হাত দিতে অথবা ইচ্ছামত মাদক নেবার স্বাধীনতা দেয়ার মতই। কোনো সমাজই এটি করে না এ কারণে যে তাতে তার ধ্বংস অনিবার্য।

নারী অধিকার সম্পর্কে এক ধরনের বিকৃত প্রচারণা তাসলিমা নাসরিনের মত বিকৃত রুচির নারীবাদীরা করে থাকেন। তাদের বক্তব্য হলো নারী তার শারিরীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীন। এ স্বাধীনতা শিশুকে আগুনে হাত দিতে অথবা ইচ্ছামত মাদক নেবার স্বাধীনতা দেয়ার মতই। কোনো সমাজই এটি করে না এ কারণে যে তাতে তার ধ্বংস অনিবার্য।

নারীবাদীরা ইসলামের বিধি বিধানকে নারী স্বাধীনতার প্রতিপক্ষ বানিয়ে প্রচারণা চালায়। আজ ভারতীয় সমাজে নারী নিগ্রহের যে চিত্র তার চেয়ে ভয়াবহ ছিল প্রাক ইসলামী যুগের আরব সমাজের অবস্থা। নারী শিশুকে জীবিত কবর দেয়া হতো। নারী শিশুর পিতা মাতা সমাজে লজ্জায় মুখ দেখাতে চাইতেন না। ইসলামের আবির্ভাবের পর নারীদের মর্যাদাকে অনেক উচ্চতর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পিতার তাজ্য সম্পত্তিতে ছেলের অর্ধেক মেয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু একই সাথে সমাজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়েছে ছেলের ওপর। মেয়ে তার স্বামীর আবার কোনো কোনো সময় সন্তানের রেখে যাওয়া সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সম্পত্তি ছেলের কাছাকাছি পৌছে। ইসলামে মর্যাদার ক্ষেত্রে মেয়েদের রাখা হয়েছে সুউচ্চে। দু'জন মেয়ে ও একজন ছেলের সাক্ষ্য সমান করা হয়েছে। মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনকে সন্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাস করা হয়েছে পরিবার কেন্দ্রীক। পরিবার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ইউনিট। এই ভিত্তি স্তরে শান্তি শৃংখলা সহমর্মিতা ও শোভন সম্পর্ক থাকলে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শান্তিকে নিশ্চিত করে। ফলে প্রকৃত ইসলামী সমাজে নারীর নিরাপত্তা ও শান্তি যতটা নিশ্চিত হয় ততটা অন্য সমাজে দেখা যায় না। ইসলামী খেলাফতের সময় সাম্রাজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে একজন সুন্দরী রমণী একা ভ্রমণ করলেও তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার মত পরিবেশ ছিল না।

কর্মক্ষেত্রে কাজ করা বা উপার্জনে নিয়োজিত হবার ক্ষেত্রেও নারীর ওপর কোনো বিধি নিষেধ দেয়া হয়নি। তবে নারীর উপার্জন ব্যয় করার এখতিয়ার একান্তভাবেই তার। সংসারে নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করবেন স্বেচ্ছায়, দায়িত্বের জন্য নয়। কারণ ইসলামে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব সমর্পণ করা হয়েছে পুরুষের উপর।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার নিয়ে বিতর্ক তুলছে নারীবাদীরা। এর জের ধরে একবার উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের কথাও বলা হয়েছিল। নারী নীতিতে আরো অনেক কিছু রাখা হয় যার সাথে ইসলামের বিধি বিধান সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি মূলত করা হয়েছে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত সিডো সনদকে সামনে রেখে। এই সিডো সনদে বিয়ে বহির্ভুত অবাধ সম্পর্কের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে যা কার্যকর হলে পরিবার ভেঙে পড়বে, সন্তানের পিতৃ পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে খ্রীস্টানদের ধর্মীয় নেতা পোপ ও ভ্যটিকানসহ অনেক মুসলিম ও খ্রীস্টান দেশও আপত্তি জানিয়েছে। এই সিডো সনদের বাস্তবায়ন চায় নারীবাদীরা। তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হলে ভারতীয় সমাজে আজ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের অবস্থা হতে পারে তার চেয়েও ভয়াবহ। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম সর্বোত্তম উপায়েই নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে। আর নারীবাদী ও নাস্তিক্যবাদিরা মেয়েদেরকে কেবল আলংকারিক ও ভোগ্যপণ্য রূপেই বিবেচনা করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারী জাতির উন্নতির বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে তাদের নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মস্থল, সম্মানজনক জীবিকা এবং কর্মজীবি নারীদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঘরে-বাইরে ও কর্মস্থলে নারীদের নিগ্রহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে পোষাক ও বেশভূষায় শালীনতা ও হিজাব পরিধান। অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে অবাধ ও অশালীন মেলামেশা নারীর জন্য কোনো কল্যাণ নিয়ে আসে না। এসব নারী-নির্যাতন, হয়রানী, সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোরিয় উপদ্বীপে ওয়াচকন-২ পাকিস্তানে নির্বাচন এবং বোস্টনে রক্ত

নোমান বিন আরমান

ঘাম দিয়ে জ্বর সারার ব্যাপারই ঘটেছে কোরিয় উপদ্বীপে। তুমুল উত্তেজনা, হুমকি, পাল্টা হুমকি আর যুদ্ধপ্রস্তুতির আপাত 'অবসান' ঘেছে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে। ফেব্রুয়ারিতে উত্তর কোরিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চলানোর প্রেক্ষিতে দেশটির উপর জাতিসঙ্ঘের কঠোর 'নিষেধাজ্ঞা', মার্কিন মুলুকে অস্থিরতা আর কোরিয় অঞ্চলে বাজে যুদ্ধের দামামা। অবস্থা আন্দাজের জন্য দক্ষিণের রাজধানী সিউলের পরিস্থিতি পরিমাপের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বুঝাতে 'ওয়াচকন-৪' ব্যবহার করা হয়। মধ্যমানের উত্তজনার জন্য ব্যবহার হয় ওয়াচকন-৩। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর '৪৮-এ ভাগ হওয়া রাষ্ট্র দুটিতে প্রায় সময়াই ওয়াচকন-৩ অবস্থার তৈরি হয়েছে। তবে এবার দক্ষিণের রাজধানী সিউল পরিস্থিতিকে ওয়াচকন-২ হিসেবে বিবেচনা নেয়। এর অর্থ হচ্ছে কঠিন উত্তেজনা। ওয়াচকন-১ হচ্ছে যুদ্ধ চলছে। এই অবস্থায় দক্ষিণের মদতকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য যেকোনো সময়ের বিচারে উত্তরের এই রণহুঙ্কারকে অধিক বিপজ্জনক হিসেবে নেয়। ফলে তাদের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ে। অনেকটা মায়ের চেয়ে মাসির দরদের মতই। উত্তরের রণহুঙ্কারে বেশি বিচলিত মনে হয় 'সর্বমময়ক্ষমতাধর দাবীদার' রাষ্ট্র আমেরিকাকে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ছুটে যান চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। উত্তর কোরিয়ার রণহুঙ্কার থামাতে জন কেরি সরাসরি অনুরোধ করেন দেশটির বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র চীনকে।

১০ এপ্রিলের মধ্যে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের নিজদেশে চলে যাওয়ার 'পরামর্শ' ও নিরাপত্তা দিতে না পারার ঘোষণায় মনে হয়েছিল, ১৫ এপ্রিলের দিকে দক্ষিণ কোরিয়ায় হামলা করতে যাচ্ছে উত্তর কোরিয়া। আপাত সেটা হয়নি। ১৮ এপ্রিল উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে শান্তির আভাস মিলেছে। শর্তসাপেক্ষে তারা আলোচনায় বসার ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে তাদের শর্তকে 'অযৌক্তিক ও অভাবনীয়' বলে উড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। সিউলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র চো তাই-ইয়ং বলেছেন, 'আমরা আবারও উত্তর কোরিয়াকে এ ধরনের প্রচারণা বন্ধের জোর আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এই দাবি বুঝতে আমরা সম্পূর্ণভাবে অপারগ এবং এর ফলে কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তও গ্রহণ সম্ভব নয়।'

সংক্ষেপে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার একটা চিত্র এখানে আঁকা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা পর্যন্ত অবিভক্ত ছিল এশিয়া মহাদেশের কোরিয় অঞ্চল। তখন তারা জাপানিদের দখলে ছিল। যুদ্ধে হেরে যাবার পর জাপানিরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর কোরীয় উপদ্বীপের উত্তর অংশটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনারা এবং দক্ষিণ অংশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা দখলে রাখে। এর ফলে ১৯৪৮ সালে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া রাষ্ট্র দু'টির আবির্ভাব হয়। তখন থেকে উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শে কমিউনিস্ট ব্লকে চলে যায়। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া পুঁজিবাদি আমেরিকার মতাদর্শে পুঁজিবাদি ব্লকে যোগ দেয়। উত্তর কোরিয়ার সরকারি নাম রাখা হয় গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি নাম রাখা হয় প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া। উত্তর কোরিয়া এর রাজধানীর হয় পিয়ং ইয়াং আর দক্ষিণ কোরিয়া এর রাজধানীর হয় সিউল।

উত্তর কোরিয়ার উত্তরে গণচীন, উত্তর-পূর্বে রাশিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ কোরিয়া এবং পশ্চিমে পীত সাগর অবস্থিত। দেশটির আয়তন ১,২০,৫৩৮ বর্গকিলোমিটার। ২০০৯ সালের রিপোর্ট মতে ২০০৮ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশটির জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। শিক্ষারহার ৯৩ ভাগ। সেনাবাহিনী দশ লাখের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে কোরিয়া

প্রণালী, যা জাপান থেকে দেশটিকে পৃথক করেছে, এবং পশ্চিমে পীত সাগর। দেশটি এশিয়ার চতুর্থ ড্রাগন হিসেবে পরিচিত। –উইকিপিডিয়া

১২ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) তৃতীয় পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এর আগে ২০০৬ সালে প্রথম এবং ২০০৯ সালে দ্বিতীয় পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল দেশটি। সর্বশেষ ছোট আকৃতির যে বোমাটি পরীক্ষা করা হয়েছে, সেটির ধ্বংসক্ষমতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমার উপরে ফেলা পারমাণবিক বোমার এক-তৃতীয়াংশ। দেশটির এমন বিধ্বংশী শক্তিতে স্বভাবতই বিশ্ব উৎর্ণ্ঠিত। উদ্বেগ ছড়িয়েছে মার্কিন মুলুক ও জাতিসঙ্ঘেও। তবে বিশ্বের শান্তিকামী ও নিপীড়িত মানুষের উৎকণ্ঠা আর মানির্ক মুলুক ও জাতিসঙ্ঘের উদ্বেগের মূল্য ও ধরণ কোনোভাবেই এক নয়। এক করে দেখার সুযোগও নেই। মার্কিন ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী দোসরদের উদ্বেগের কারণ চ্যালেঞ্জ করার মত প্রতিপক্ষের সংখ্যা ও শক্তি বাড়ায়। তারা চায় বিশ্বের তাবত রাষ্ট্র তাদের অনুগত 'বন্ধু' হয়ে থাকবে। যাতে ওই বন্ধুর ঘাড়ে বন্দুক রেখে কার্যসিদ্ধি হয়। এমন নীতির ঘোরবিরোধী রাষ্ট্রের তালিকায় ফিদেল কাস্ট্রোর কিউবা, প্রয়াত হুগো শ্যাভেজের ভেনেজুয়েলা ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পাশাপাশি উত্তর কোরিয়াও উজ্জ্বল একটি নাম। বিশ্বের শান্তিকামী সাধারণ মানুষের অবস্থান বরাবরই আরোপিত যুদ্ধের বিপক্ষে। তবে যুদ্ধবাজদের চ্যালেঞ্জ করার মত শক্তিকে সবসময়ই তারা বরমাল্যে ভূষিত করেন। তাদের জন্যে অন্তরে ভালোবাসার আসন সাজিয়ে রাখেন। সে যে কেউই হোক। মার্কিন ও তাদের দোসরদের চ্যালেঞ্জ করায় বিরুপ সমালোচনা হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার বর্তমান নেতা কিম জং উনকে নিয়ে। বলা হচ্ছে, 'কম বয়েসি' বলেই 'অবিবেচক' সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তিনি। যখন তখন বাঁধিয়ে দিতে পারেন যুদ্ধ। আর এ কারণেই দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে মার্কিন মুলুকের উদ্বেগাচ্ছন্ন চেহারাটা বিশ্বের কাছে বেশি ধরা পড়েছে। কারণ, দক্ষিণ কোরিয়ায়র সঙ্গে উত্তরের যুদ্ধ হলেও এর বড় আঁচড় পড়বে মার্কিনদের ঘাড়ে। এমনিতেই যুদ্ধবিলাসের কারণে মার্কিন অর্থনীতি আর সমরশক্তি ইতিহাসের বড় ধরণের ধাক্কা সামাল দিচ্ছে ইরাক ও আফগানে। এরমধ্যে দক্ষিণের সঙ্গে উত্তর কোরিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে কোনোভাবেই মার্কিনদের জন্য তা সুখকর হবে না। কিম জন উনের বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। ২০১১ তাঁর পিতা কিম জং ইলের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব উন। দেশটির ক্ষমতাসীন দল, সামরিক বাহিনী এবং একইসঙ্গে পারমাণবিক কর্মসূচির নিয়ন্ত্রক তিনি। মার্কিন মুলুকের

> আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিনদের হাতে গণমানুষের নিহত হওয়ার খবর এক সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি তবে ভিন্নচিত্রই পাব। আমেরিকা তাদের এই তিনটি প্রাণের জন্য যে অশ্রু পাত করছে আফগান, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেনসহ বিভিন্ন দেশে ড্রোন পাঠিয়ে, যুদ্ধ করে যে লাখ লাখ নারী-শিশু ও মানবের রক্ত ঝরিয়েছে, প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এর জন্যে তাদের মোটেও দুঃখবোধ নেই। উল্টো তাদের হাতে নীপিড়নের শিকার মানুষ যখন একটু শব্দ করে তখনই তারা সন্ত্রাসীদের 'তৎপরতা' লক্ষ করে।

'হামবড়া ভাব' আর জাতিসঙ্গের একচোখা নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তুমুল আলোচনায় বিশ্বের কনিষ্ঠ এ রাষ্ট্রনেতা। এ জন্যে তাঁকে নানাভাবে খাটো করার চেষ্টা চলছে। 'কম বয়েসি' বলে বিরুপ প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ বুড়ো 'বন্ধু'র চেয়ে তাদের চ্যালেঞ্জকারী কম বয়েসি উনরা ইতিহাসে অনন্য স্থান অর্জন করে নেবেন।

পাকিস্তান

১১ মে পাকিস্তানে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশটির ৬৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার তত্ত্ববধায়কের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়েও এখন বড় খবর দেশটির সাবেক স্বৈরশাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফের গ্রেফতার কাহিনী। ১৯ এপ্রিল সকালে সে দেশের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০৭ সালের মার্চে শীর্ষস্থানীয় বিচারপতিদের গৃহবন্দী করার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট ১৮ এপ্রিল এ নির্দেশ দেন। ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা জারির পর ৬০ জনের বেশি বিচারককে গৃহবন্দী করার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে করা মামলায় জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর শুনানির জন্য ওই দিন আদালতে হাজির হন মোশাররফ। আদালত তার আবেদন খারিজ করে তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। এরপরই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজস্ব নিরাপত্তাবলয়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত আদালত থেকে বেরিয়ে বাসভবনে চলে যান। পাকিস্তান পুলিশ রাতে গৃহবন্দী ও শুক্রবার সকালে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে উপস্থাপন করে। ২০০৮ সালে তার দল পরাজয় বরণ করার পর অভিশংসনের মুখে রাষ্ট্রপতির পদ ছাড়েন। এরপর গ্রেফতার এড়াতে দুবাই চলে যান। সেখানে থেকে ২৪ মার্চ পাকিস্তানে ফেরার আগ পর্যন্ত ৫ বছর তিনি ব্রিটেনে নির্বাসনে ছিলেন। দেশে ফিরেই চারটি আসনে নির্বাচনের জন্য আবেদন করেন পারভেজ মোশাররফ। তবে তার সব ক'টি আবেদনই নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দেয়। এর ফলে নির্বাচন করে আবারও শাসক হওয়ার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় এ স্বৈরশাসকের। পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানের সবচেয়ে ধিকৃত শাসক ছিলেন। তার হাত বহু নিরপরাধ নারী-শিশু মানবের রক্তে রঙিন হয়েছে। তার সময়েই পাকিস্তানে ড্রোন হামলা শুরু হয়েছে। তিনিই পাকিস্তানের ভূখন্ড ব্যবহার করে আফগানিস্তানে মার্কিনদের হামলার সুযোগ করে

দিয়েছিলেন। পারভেজ মোশাররফই পাকিস্তানের লাল মসজিদ ও জামেয়া হাফসায় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে নিরপরাধ নারী-শিশু ও মাদ্রাসা ছাত্রীদের হত্যা করেছিলেন। এসব পাকিস্তানিরা ভুলে যাননি। তাই নির্বাচন কমিশন তাঁর আবেদন বাতিল না করলেও তিনি যে জয়ী হতে পারতেন না এটা অনেক পাকিস্তানিই বিশ্বাস করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের অশ্রুর জয় হয়েছে। এই জয় পাকিস্তানে অব্যাহত থাকুক এটাই সবার প্রত্যাশা।

বোস্টন

পৃথিবীর কোনো মানুষের রক্তই দু'ধরণে নয়। সবার রক্তই একরকম। লাল। সবার রক্তের ভাষাও এক। তাই যখন নিরপরাধ কোনো মানুষের রক্ত ঝরে তখন গোটা পৃথিবী কেঁপে ওঠে। কেঁদে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে ১৪ এপ্রিল যখন ম্যারাথন দৌড়ে বোমায় রক্ত ঝরল তখন স্বভাবতই ব্যতিত হল শান্তিকামী মানুষের অন্তর। এতে নিহততের জন্য অবশব্যই সমবেদনা রয়েছে সবার। কিন্তু এতে করে মার্কিন চরিত্রের দিকটি আবারও উন্মোচিত হয়েছে। বোস্টনে বোমা হামলায় মারা গিয়েছেন ৩ জন। এদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। আহত হয়েছেন দেড়শতাধিক। এসই দুঃখজনক। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিনদের হাতে গণমানুষের নিহত হওয়ার খবর এক সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি তবে ভিন্নচিত্রই পাব। আমেরিকা তাদের এই তিনটি প্রাণের জন্য যে অশ্রু পাত করছে আফগান, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেনসহ বিভিন্ন দেশে ড্রোন পাঠিয়ে, যুদ্ধ করে যে লাখ লাখ নারী-শিশু ও মানবের রক্ত ঝরিয়েছে, প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এর জন্যে তাদের মোটেও দুঃখবোধ নেই। উল্টো তাদের হাতে নীপিড়নের শিকার মানুষ যখন একটু শব্দ করে তখনই তারা সন্ত্রাসীদের 'তৎপরতা' লক্ষ করে। মানবতার ফেরিয়ালদের এমন দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে আজ যেমন উত্তর কোরিয়া সোচ্চার। এভাবেই জাগবে অন্যরাও। আমরা নীপিড়ত মানুষের প্রতিরোধকেই স্বাগত জানাব।

কিতাবুল ঈমান

শায়খুল হাদিস মুফতি জসীমুদ্দীন রাহমানীর কলমের অনবদ্য বহমানতা, বৈচিত্রময় বিষয় নির্বাচন, বাক্যের সহজ নির্মান, শব্দের ছান্দিক গাঁথুনি, সর্বোপরি কুশলি উপস্থাপন পাঠককে সত্যের দিশা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিতও করবে। কৌতুহলী করে টেনে নিয়ে যাবে শেষ অবধি।

আত তিবইয়ান ডেস্ক : শিরক বিদআতের নগ্ন থাবায় হিরন্ময় ঈমান আজ হারাচ্ছে তার সরল গতিপথ। দ্বীনের নামে অজস্র বদদ্বীনির ফটক হচ্ছে উন্মুক্ত। একত্ববাদের আহবান যেনে ক্রমেই নিথর হচ্ছে ডানাভাঙা পাখির মতো। তাগুতের প্রত্যহিক পদচারনা থামিয়ে দিতে চাচ্ছে ঈমানি তরঙ্গের প্রবাহমানতা। দুনিয়াব্যপী চলছে গায়রে হকের প্রকাশ্য ধূলিঝড়। এই ঝড় কি তবে থামিয়েই দেবে আলোর পথের পথযাত্রিদের? রুদ্ধ কি তবে হয়েই যাবে আলোর পদযাত্রা? উম্মত কি দেখা পাবে না কোনো আইয়ুবীর? কোনো সিপাহসালারের কলম কি জ্বলে উঠবে না তাগুতের প্রতিবাদে?

এমনি শত প্রশ্ন যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলো মুমিনদের হৃদয় অন্দরে অন্দরে, তখনি শায়খ জসীমুদ্দীন রহমানীর ধারালো কলম জেগে উঠলো। নিরবতার আদল ভাঙলো। শানিত হলো উম্মতে মুহাম্মাদির কল্যাণচিন্তায়। শায়খ জসীমুদ্দীন রাহমানী দামাত বারকাতুহুম লিখে চললেন একের পর এক প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি লিখেছেন অনবদ্য এক গ্রন্থ 'কিতাবুল ঈমান'। যদিও গ্রন্থটির মূল উপজীব্য কুরআন ও হাদিস তথাপি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা যৌক্তিক আলোচনা একে করে তুলেছে হৃদয়গ্রাহী। প্রথম অধ্যায়ে মানবজাতি সৃষ্টির ইতিহাস থেকে শুরু করে চন্দ্র ও সৌরজগত, পশু-পাখি জাতিয় প্রাণীর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরার অভিনব আলোচনা গ্রন্থটিকে পৌঁছে দিয়েছে অনন্য উচ্চতায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহর একত্ববাদের বিষয় ভিত্তিক আলোচনার প্রাজ্ঞতা শিরকের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো হাওয়ার প্রবল ঝাঁকুনির মতোই। এ অধ্যায়ে তাওহিদ ও তাগুতের পরিচয় আকৃষ্ট করবে পাঠককে। ভন্ড পীর-ফকির, যাদুকর, গণকের পরিচয়, উন্মোচনে গ্রন্থটি পথ দেখাবে সরল মুমিনদের।

তৃতীয় অধ্যায়ে আল্লাহর আদেশ, সুদ ও অহী বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থটিকে করেছে সমৃদ্ধ। এছাড়া দ্বীনের হেফাজত, জানের হেফাজত, আক্বল-বুদ্ধির হেফাজত, বংশ ও মানমর্যাদা হেফাজতের শরয়ী আলোচনা বিবৃত হয়েছে। বিশেষত এই আলোচনাটি মুসলিম উম্মাহর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। এর চতুর্থ অধ্যায়ে আল্লাহর নিষেধ সমূহের আলোচনা পাঠকের জন্য হয়ে উঠবে সোনায় সোহাগা।

শায়খুল হাদিস মুফতি জসীমুদ্দীন রাহমানীর কলমের অনবদ্য বহমানতা, বৈচিত্রময় বিষয় নির্বাচন, বাক্যের সহজ নির্মান, শব্দের ছান্দিক গাঁথুনি, সর্বোপরি কুশলি উপস্থাপন পাঠককে সত্যের দিশা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিতও করবে। কৌতুহলী করে টেনে নিয়ে যাবে শেষ অবধি। পাঠক! আসুন গ্রন্থটি পড়ি। নিজেকে আলোকিত করি।

মায়ানমার
শেষ কী হবে না এই নারকীয়তার?

মায়ানমারে প্রতিদিনই মরছে মানুষ। লাশের সারি হচ্ছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। ছেলে বুড়ো থেকে শুরু করে কোলের শিশুটিও রক্ষা পচ্ছে না রাখাইনদের হিংস্রতার কবল থেকে। এই নাজুক অবস্থার কি পরিবর্তন হবে না? শেষ কি হবে না এই নারকীয়তার? কবে? কবে আসবে সেদিন যেদিন মুসলমান পরিচয়ে একটি শিশু নিরাপদে বেড়ে উঠবে মায়ানমারের মাটিতে? এই প্রশ্ন আজ ঘুরপাক খাচ্ছে প্রতিটি মুসলমানের হৃদয় থেকে হৃদয়ে। তাই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হতে পারে, মায়ানমারের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর করনীয় কি? এমন সব প্রশ্নের উত্তর জানতেই কয়েকজনের মুখোমুখি হয়েছিলেন 'আত তিবইয়ান' প্রতিবেদক **নকীব মাহমুদ**

সকল মতপার্থক্য ঝেড়ে ফেলতে হবে

মুফতি হুসাইন আহমদ

কলামিষ্ট ও আলেম মুফতি হুসাইন আহমদ বলেন– 'রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর রাখাইনদের এ হামলা নতুন নয়। সেই ১৭৭৫ সাল থেকেই রাখাইনরা হত্যা করে চলেছে নিরিহ রোহিঙ্গাদের। কিন্তু বিশ্ব বিবেক এ বিষয়ে বরাবরই নিরব ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু কেনো এই নিরবতা তা সবারই জানা। আর তা হলো, ওরা মুসলমান। মুসলমানদের এই চরম দুঃসময়ে আমাদের আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই। আমাদের বড় পরিচয় আমরা মুসলমান। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে আমাদের ভায়েরা মার খাবে আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখবো এটা হতে পারে না। অতএব আমি মনে করি, সকল মতপার্থক্য ঝেড়ে ফেলে এখনই সময় আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার।'

জান ও মাল দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করতে হবে

মোঃ মনযিল হক

গার্মেন্টকর্মী মোঃ মনযিল হক বলেন– 'আমাদের এখন করণীয় একটাই। জান ও মাল দিয়ে মায়ানমারের মুসলমানদের সাহায্য করতে হবে। আমরা অনেক ধৈর্য্য ধরেছি। অনেক সয়েছি। আর না। আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, রাখাইন বৌদ্ধরা নিরিহ মুসলমানদের হত্যা করছে। পুড়িয়ে মারছে। ফাঁসিরকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মারছে। মা বোনের ইজ্জত ছিনিয়ে নিচ্ছে। অথচ এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। তারা যখন তাদের সরকারের কাছে বিচার নিয়ে যাচ্ছে, সরকার উল্টো তাদেরকেই শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু কেনো? কেনো এই নির্মমতা মুসলমানদের ওপর? শুধুই কি তারা মুসলমান বলে? আমরাতো তা-ই দেখছি। যদি এটাই সত্যি হয়, তাহলে আমি মনে করি আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। কারণ আমরাও তো মুসলমান। আর একজন মুসলমানের পক্ষে তার অপর মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসাই তো স্বাভাবিক। তাই আমি মনে করি, তাদের জান-মাল দিয়ে সাহায্য–সহযোগিতা করা উচিত।'

এখনি একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে

আমেরিকান ইন্টাঃ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর স্টুডেন্ট মোঃ নাবিল বলেন– 'আমরা আসলে হুজুগে বাঙ্গালি। কখনোই কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। নিজের মেধাকে কাজে লাগাই না। মুখের শুনা কথাই বিশ্বাস করে ফেলি। আর আমাদের সমাজের অবস্থা কি তাতো সবারই জানা। সত্যকে কখনোই মেনে নেই না। ভাবি, সত্যটা আড়ালে থাকলেই ভালো। আর যে কাজটা করতে ভালোবাসি তা হলো, সত্যকে গোপন করে নিজেরা ভ্রান্ত হচ্ছিই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও ভ্রান্ত করার চেষ্টা করছি। মিথ্যেকে খুব জোরালোভাবে প্রচার করি। যার ফলে সত্য থেকে যায়

আড়ালেই। যার জলন্ত প্রমাণ মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান। আজ তাদের সম্পর্কে সমাজে কতই না কুদৃষ্টি তৈরি হচ্ছে। তাই আমি মনে করি আগে মানুষের মন ও মননে পরিবর্তন আনতে হবে। সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মুসলমানদের সম্পর্কে সবার মাঝে ইতবাচক ধারণা দিতে হবে।'

আমাদের মিডিয়া চাই

আব্দুল আহাদ

ম্যাপেল লীপ ইন্টাঃ স্কুল-এর ছাত্র আব্দুল আহাদ বলেন– আমাদের আগে বুঝতে হবে কেনো আমরা এতো পিছনে পড়ে গেলাম। কেনো আজ আমরা অন্যের গোলামী করে বেঁচে আছি? এইতো কদিন আগেও চিত্র ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা ছিলাম রাজা আর ওরা (ইসলামের শত্রুরা) ছিলো প্রজা। আমাদের পা চেটে চেটে ওরা নিজেদের পেটে খাবার দিয়েছে। হায়! একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস!! আসলে এই অপমান আমাদের ভাগ্যে কি এমনি এমনি এসে জুটেছে নাকি আমরাই তা ডেকে এনেছি? আমরা যখন ধীরে ধীরে সত্য থেকে দূরে সরে গেলাম, অবহেলা করতে শুরু করলাম দেশের জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে ঠিক তখনই আমাদের পতন শুরু হয়েছে। আমরা আজ হাতছাড়া করে ফেলেছি যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার মিডিয়াকে। আর এই সুযোগে শত্রুরা আমাদের এই মিডিয়া দিয়েই আঘাত করছে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যা কে সত্য বলে চালিয়ে দিচ্ছে। যে কারণে সাধারণ মানুষদেরকে আমরা আমাদের পাশে পাচ্ছি না। তাই আমি মনে করি মায়ানমারের বর্তমান এই পরিস্থিতিতে মিডিয়াকে আমাদের দখলে নিতে হবে। মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যটা পৌঁছে দিতে হবে সবার দ্বারে দ্বারে। মিডিয়ার মাধ্যমেই জাতিকে দেখিয়ে দিতে হবে রাখাইনদের ভয়ঙ্কর সব হিংস্রতা। খুলে দিতে হবে রাখাইনদের ভদ্রতার মুখোশ। মিডিয়ার মাধ্যমেই বিশ্বনেতাদের কাছে আমাদের দাবি পৌঁছে দিতে হবে।'

বাংলাদেশের সরকার কে এগিয়ে আসতে হবে

শামীম শাকির

ছড়াকার, কবি শামীম শাকির বলেন– 'আমি মনে করি এই মুহূর্তে মায়ানমারের বিষয়ে একটা কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, রোহিঙ্গা মুসলমানরা যখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে নদী পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে চেয়েছে ঠিক তখনই বাংলাদেশ সরকার তার মানবিক মূল্যবোধটুকু দেখাতেও ভুলে গেছে। আমি বুঝি না সরকার কি মুসলমান! যদি মুসলমানই হয়ে থাকেন তাহলে আরেক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এতো নির্দয় হন কিভাবে! আমি মনে করি সরকার মুরতাদ হয়ে গেছে। তাই দেরি না করে এখনই সরকারকে চাপে ফেলতে হবে। নয়তো মায়ানমারের মতই অবস্থা হবে আমাদের দেশের। সরকারকে বুঝাতে হবে ওরাও আমাদের ভাই। ওদের সহযোগিতায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।'

আলেমদের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে

আবু ওসামা

ব্যবসায়ী আবু ওসামা বলেন– 'মায়ানমারের বর্তমান এই পরিস্থিতিতে আমাদের দুটি কাজ একান্তই করণীয়। প্রথমত : মিডিয়াগুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে । মিডিয়ায় আলেম সমাজকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বেও সকল মুসলমানের অবস্থা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। দিতীয়ত : আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে খতিবদের আরো সচেতন হতে হবে। মানুষ এখনো খতিবদের কথা শুনে, মানে। তাই তাদের উচিত বিশ্বের সকল মুসলমানের অবস্থা জাতির সামনে তুলে ধরে তাদের ঘুমিয়ে পড়া বিবেক জাগিয়ে তুলতে হবে। এ দুটি কাজ যদি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় মায়ানমার তথা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের উপকারে আসবে।'

আমরা দেখেছি যে, রোহিঙ্গা মুসলমানরা যখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে নদী পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে চেয়েছে ঠিক তখনই বাংলাদেশ সরকার তার মানবিক মূল্যবোধটুকু দেখাতেও ভুলে গেছে। আমি বুঝি না সরকার কি মুসলমান! যদি মুসলমানই হয়ে থাকেন তাহলে আরেক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এতো নির্দয় হন কিভাবে! আমি মনে করি সরকার মুরতাদ হয়ে গেছে।

আমাদের দরদী দিলওয়ালা হতে হবে

ওমর ফারুক

সমাজসেবক ওমরফারুক বলেন– 'মিডিয়ায় বিভিন্ন সময় দেখেছি মুসলমানদের কী নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। মা-বোনকে কিভাবে অপমান করা হয়েছে।
ছোট ছোট শিশুদের কিভাবে জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কিন্তু এতো কিছুর পরও আমরা নিরব ভূমিকা পালন করছি।
আমাদের ভেতর কোনো পরিবর্তনই লক্ষ করা যায় না।
রাখাইনদেরকে ঘৃণার পরিবর্তে কোনো এক অদৃশ্য কারণে আমরা আজো রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকেই ঘৃণা করে যাচ্ছি।
এরকম হীনমানসিকতার পরিবর্তন কবে হবে তা ঠিক আমার জানা নেই। তবে দ্রুতই এর পরিবর্তন দরকার, তা না হলে আমাদের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি।
আর কোনো কালক্ষেপণ করা যাবে না। এই মূহুর্তে অর্থসহ সব সরকম সাহায্যই তাদের করতে হবে।'

আল্লাহর সৈনিক

ড. মিসকীন হেজাযী
ভাষান্তর : মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

(পূর্ব প্রকাশের পর)

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে ইবনে মুসলিম খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে সমগ্র মধ্য এশিয়া জয় করে নেন। তিনি অত্র অঞ্চলসমূহের সুষ্ঠ পরিচালনা ও উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় কতিপয় আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি সর্বত্র ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে কোহেকাফের দাগিস্তান অঞ্চলে প্রবেশ করেন। দাগিস্তানের যে অধিবাসীদেরকে কোনো প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাহর দুর্ধর্ষ সৈন্যরাও জয় করতে অক্ষম ছিলো, এই গুটিকতক বুযুর্গ অতি অনায়াসে তাদেরকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে দাগেস্তানের সব ক'টি গোত্র ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। লক্নয, কাজী কুমুখ, আনধী ও দীদুসহ অসংখ্য গোত্র এক এক করে মুসলামান হয়ে যায়। এর পর চেচনিয়ায় ইসলাম বিস্তার পেতে শুরু করে। এক সময়ে সকল চেচেনও মুসলমান হয়ে যায়।

অডলেশিয়ার বেশির ভাগ বসতি ছিলো খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলো রাশিয়ার মতো প্রভাবশালী খৃষ্টান রাজ্য। রুশ শাসকরা ইসলামকে খ্রীষ্টবাদের জন্য হুমকি সাব্যস্ত করে অত্র অঞ্চলসমূহে একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করে রাখতো। কিন্তু ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকানো তাদের পক্ষে ছিলো অসম্ভব। কবারোয়া ও সাকাশয়ার অখৃষ্ট সম্প্রদায় সমূহ ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

ইসলাম এই কোহেস্তানী গোত্রগুলোকে জীবনের এক নতুন তাৎপর্যের সাথে পরিচিত করে। ইসলাম তাদেরকে ব্যক্তি ও গোত্রগত স্বার্থের জন্য লড়তে ও মরতে নিষধ করে এবং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার পাঠ শিক্ষা দেয়। তবুও তাদের হৃদয়ে বদ্ধমুল সেই গোত্রীয় বিরোধ সমূলে বিলুপ্ত হলো না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা বদ্ধমূল চরিত্রের কিছুটা তখনও অবশিষ্ট থেকে যায়। সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায় যদিও এক আল্লাহ, এক রাসূল (সা:) ও এক কিতাবের অনুসরণ করতো, তবুও তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারলো না। কোহেকাফের বিভিন্ন অবয়বের পর্বত আর তার আলাদা বৈশিষ্ট্য তাদের এই ঐক্যের পথে প্রকৃতিগত অন্তরায় প্রমাণিত। মুসলমানরা যখন তুর্কী ও ইরানী সেজে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হলো এবং আলিম-ওলামা দ্বীন ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করার পরিবর্তে সম্পদের লোভ ও সম্মানের মোহে বুঁদ হয়ে পড়ে রইলেন, তখন আসমানী রীতি অনুযায়ী ইতিহাস তাদের অকর্মণ্যতা ও কপটতার উপযুক্ত সাজা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

পুনরুত্থানের পর ইউরোপ শিল্প বিপ্লবের সুফলে দিন দিন সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। তীরের স্থান দখল করে বুলেট। তরবারীর মোকাবেলায় আসে তোপ।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব এক করুণ অবস্থায় নিপতিত হয়, শিকারীর কবলে আটকে পড়া বন্য হরিণ যেনো এরা সবাই। চতুর্দিক থেকে রণহুঙ্কার ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদী দৈত্য তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়। ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তুগীজরা ইসলামী রাজ্যগুলোকে টার্গেটে পরিণত করে নেয়। ইসলামী বিশ্ব নিরবে সেই বৃক্ষের উদাহারণ পেশ করছিলো, যার ডালপালা এক এক করে কাটা হচ্ছে; কিন্তু তার কিছুই বলার নেই।

ইংরেজ,ফরাসী ও পর্তুগীজদের বিজয় ইতিহাস সর্ম্পকে পাঠক সমাজ অবগত হলেও রাশিয়া মধ্য এশিয়া

এবং কোহেকাফে কী প্রলয় ঘটিয়েছিলো, তার বিস্তারিত বিবরণ অনেকেরই অজানা। আলোচ্য উপাখ্যান সেসব ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত।

দাগেস্তান, চেচনিয়া ও কবারদার সাথে সম্পৃক্ত। কাহিনীর গতিময়তা কোহেকাফের আকাশচুম্বী পর্বতমালার মতো উন্নত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোহেকাফের সমতল ভূমির ন্যায় বিধ্বস্ত-শায়িত। সুযোগে উত্তম নীতিকথা সকলেই বলে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করার তাওফিক অল্প লোকেরই হয়। কার্যক্ষেত্রে মাত্র এক টিপু প্রমাণ করেছিলেন, 'সিংহের একদিনের জীবন শিয়ালের শত বছরের জীবন অপেক্ষা উত্তম।' মীরজাফর মীর সাদেক চরিত্রের লোকের অভাব হয় না। তারা পরিস্থিতির সঙ্গে কেবল আপোসই করে না, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দেশ, জাতি, রাষ্ট্রকে বিক্রিও করে দেয়। ইতিহাসের পাতায় ঘৃণার পাত্র ছাড়া এদের ঠাঁই নেই।'

মহান লক্ষ্য অর্জনে ত্যাগ স্বীকার করা, প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়া মানব চরিত্রের এমনি এক মহত্ত্ব, যা অল্প লোকের ভাগ্যে জুটে। তাই রণক্ষেত্রে সবকিছু বৈধ ভাবার পরিবর্তে উন্নত নীতি আঁকড়ে থাকাই মহত্ত্বের প্রমাণ। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর ন্যায় ইমাম শামিলও এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যার নীতিপ্রিয়তা, মহানুভবতা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা তার একান্ত দুশমনও স্বীকার করেছে। কিন্তু এই স্বীকৃতিদানকারী দুশমনদের চরিত্র এমন জঘন্য ছিলো, তারা ইমাম শামিলের মাসুম শিশুকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। ইমাম তার বাহুবলে, শক্তি প্রয়োগে সে শিশুপুত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ততোক্ষণে শিশুর মা তার কলিজার টুকরোর বিরহ ব্যথায় ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। কয়েক বছর পর যখন পুত্র বাড়িতে ফিরে আসে, তখন এখানকার আবহাওয়া তার সহ্য হলো না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ইমাম শামিলের পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত। শত্রুপক্ষ তার চিকিৎসায় বাঁধ সাধলো, শর্ত আরোপ করলো। কিন্তু পিতা আপোসহীন। নীতির প্রশ্নে পুত্রের মৃত্যু তার নিকট স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের মোকাবেলায় ব্যক্তি স্বার্থের লক্ষ্যে দুশমনের কোনো শর্ত মেনে নেয়া তার পক্ষে কল্পনাতীত বিষয়।

ইমাম কোহেস্তানী মানুষ। তারাও কোহেস্তানী, যারা শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমি, স্বজাতি ও ভাইদের মোকাবেলায় লড়াই করছে। জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের ঈমান-বিশ্বাস ও বোন-কন্যাদের ইজ্জত দুশমনদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কোহেস্তানীদের চরিত্রের এই দু'টি প্রান্তধারা আদিকাল থেকে প্রবাহমান। সকলে একই জনপদের বাসিন্দা, একই আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষ। কিন্তু একজনের স্বভাব ঈগলের মতো বলিয়ান ও আপোসহীন, অপর জনের স্বভাব ধূর্ত শিয়ালের অনুরূপ।

দাগেস্তানসহ আশপাশ এলাকার মানুষ জনবসতিকে 'আওল'বলে। এই আওল তথা জনবসিতগুলো পাহাড়ের ঢালে ঢালে গড়ে ওঠে। প্রথমে ঢালের কিছু অংশকে সমান করে সেখানে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ছোট ছোট ঘর নির্মাণ করা হয়। প্রথম ঘরটি নির্মাণ করা হয় পাহাড়ের পাদদেশে। তারপর তার ছাদ বরাবর জমি সমতল করে দ্বিতীয় ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, প্রথম ঘরের ছাদ দ্বিতীয় ঘরের আঙিনায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় ঘরের ছাদ তৃতীয় ঘরের বারান্দার কাজ দেয়. এভাবে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রতিটি সারিতে পনের-বিশটি করে ঘর নির্মিত হয়। কোনো 'আওল' এ ধরনের ঘরের নয়টি সারি থাকে, কোথাও ঊনিশটি, কোথাও বা ঊনত্রিশটি। দূর থেকে দেখলে এগুলোকে বিশাল সোপান মনে হবে। প্রতি দু'সারির মাঝে এমন কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা হয়, যা আওলের গলির কাজ দেয়।

এখানকার যুদ্ধ-বিগ্রহে আওল দুর্ভেদ্য দুর্গের ভূমিকা পালন করে। দুশমন যদি কোনো আওলের উপর হামলা করে, তাহলে আওলের বাসিন্দারা উঁচুতে অবস্থান করার সুবাদে অতি অনায়াসে আক্রমণকারীদের বিপুল ক্ষতিসাধনে সক্ষম হয়। প্রতিটি ছাদে প্রচুর পরিমাণ পাথর রাখা থাকে। শত্রু পক্ষ নিচ থেকে উপরে উঠার চেষ্টা করলে হামলাকারীদের জন্য এই পাথর ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। পাথরে কাজ না হলে তখন তেগা আর জুস্তা খঞ্জর ব্যবহৃত হয়।

মুসলিম গোত্রগুলোতে বিবাহ-শাদী ইসলামী তরিকায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু কনের পিতা-মাতার বর হিসেবে বীর ছেলে আবশ্যক। কোনো কোহেস্তানী নারী কখনোই এ তিরস্কার বরদাশত করবে না, তার স্বামী কাপুরুষ বা রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার নয়। এ জনপদে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করার পূর্বে কনের পিতা-মাতা বর হিসেবে এমন দুরন্ত যুবককে বেছে নিতো, যে অন্তত নয়জন দুশমনের কর্তিত্ব হাত দ্বারা মালা গেঁথে ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে অহঙ্কারে হেলেদুলে কনের বাড়ি আসতো। অন্যথায় বিয়ের পূর্বে বর কনের পিতাকে সামর্থ অনুযায়ী নয়টি ভেড়া বা নয়টি বকরি কিংবা নয়টি ঘোড়া অবশ্যই উপহার স্বরূপ প্রদান করতো।

তাদের জীবন 'নয়' অংকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। প্রতিটি ঘরে নয় প্রকারের খঞ্জর থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে সম্মানিত মনে করা হতো, যার কাছে প্রত্যেক প্রকারের খঞ্জর এবং নয়টি ঘোড়া থাকতো। কেউ মারা গেলে নয়দিন শোক পালন করা হতো। লড়াইয়ের ময়দানে কেউ কাপুরুষতা দেখালে কপাল থেকে এই কাপুরুষতার কালিমা দূর করার জন্য তাকে নয়দিন সময় দেয়া হতো। শিশুদের জন্য আবশ্যক ছিলো যেনো তারা নয় বছর বয়সে খঞ্জর চালাবার দক্ষতা অর্জন করে। কোনো কোনো গোত্রে বিয়ের সময় কন্যাদেরকে যৌতুক দেয়ার নিয়ম ছিলো। এই যৌতুক যা কিছু দেয়া হতো, সংখ্যায় তা নয় হওয়া জরুরি ছিলো। যেমন নয় জোড়া কাপড়, নয় জোড়া পাদুকা, নয় জোড়া অলঙ্কার ইত্যাদি। ঊনিশ কিংবা ঊনত্রিশ সংখ্যাকেও তারা সৌভাগ্যের প্রতীক ভাবতো। প্রতি নবম সংখ্যাই

ছিলো তাদের বিশ্বাসে সৌভাগ্যের বাহক ।

জার রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিলো আট লাখ । অফিসার তেত্রিশ হাজার । চার লাখ সিপাহী আর সাত হাজার অফিসার ছিলো রিজার্ভ ফোর্সে । কেবল যুদ্ধের সঙ্গীন সময়ে রিজার্ভ বাহিনীকে ময়দানে হাজির করা হতো । মোট বাহিনীর দশ শতাংশ তোপখানায় আর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অগ্রগামী ক্ষুদ্র বাহিনীর দায়িত্ব পালন করত ।

এর থেকে আড়াই লাখ রুশ সেনা স্বতন্ত্রভাবে সেসব অঞ্চলে অবস্থান করতো, যেসব জায়গায় কোহেস্তানীরা প্রায়ই আঘাত হানতো ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশ সেনাবাহিনী কোহেকাফে জোরদার আক্রমণ অভিযান শুরু করে । ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জর্জিয়ায় রাশিয়ার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জর্জিয়াকে রাশিয়ার অর্ন্তভুক্ত করে তার শাসনভার জার-রুশের মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করা হয় । ১৮০৩ সালে মংগ্রেলিয়া এবং ১৮০৪ সালে আমরেতিয়াও রাশিয়ার দখলে আসে । তারপর অন্যান্য কোহেস্তানী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকসমূহ রাশিয়ার পদানত হতে থাকে । আমরেতিয়ার পার্শ্ববতী অঞ্চল আসু ও শামুখ ১৮১০ সালে জার-রাশিয়ার দখলে আসে । তাতারীদের ছোট ছোট স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র গঞ্জ, নোখা এবং শোশাদও ১৮১০ সালে রাশিয়া দখল করে নেয় ।

১৮১৩ সাল নাগাদ শেরওয়ান, দরবন্দ এবং বাকুও রাশিয়ার দখলে এসে পড়ে ফলে জার রুশ-এর প্রত্যয় জন্মে, এবার ইরান এবং উসমানীয় সালতানাত দখলের আশায় হাত বাড়ানো যায় কিন্তু দাগেস্তান, চেচনিয়া ও কবারদার কিছু অঞ্চল এখনও স্বায়ত্বশাসিত । এসব এলাকা দখল করার জন্য যেসব বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো, তার চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে গেছে । ফলে রুশ রাজা অত্র অঞ্চলসমুহের অবাধ্য লোকদের শায়েস্তা করার জন্য উগ্র সেনাপতি ইয়ারমুলুককে প্রেরণ করেন ।

সেনাপতি ইয়ারমুলুক প্রচন্ড হামলা চালায় । ইয়ারমুলুক কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে বার মাইল দূরে দাগেস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তমীরখানশোরায় সেনা ছাউনী গড়ে তুলে । সেখানে থেকে সে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিম দিকে অভিযানে সেনাদল পাঠাতে থাকে ।

১৮২০ সালে ইয়ারমুলুক জার নেকুলাইকে লিখে জানায়, দাগেস্তানের যে অভিযান দু'বছর পূর্বে শুরু হয়েছিলো, এখন তা সফল হওয়ার পথে । আমি অধিকাংশ বিদ্রোহীকে এমন চরম শিক্ষা দিয়েছি, তারা নিজেরা কেন তাদের ভবিষ্যত বংশধরও তা ভুলবে না । যদিও এই ভুখন্ডকে অজেয় মনে করা হতো, কিন্তু এখন তা রাজাধিরাজ জার -রুশের সেবকদের পদতলগত ।

সেনাপতি ইয়ারমূলুক দাগেস্তানের কিছু অঞ্চল জয় করেছিলো ঠিক, রাজার নিকট যা সে লিখেছিলো, তার ধারণা মতে তা-ও সঠিক । কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত । দাগেস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল এবং চেচনিয়ার সমগ্র ভূখন্ড তখনও স্বাধীন । এসব এলাকার মুসলিম গোত্রগুলো আপন আপন কাজে নিমগ্ন ছিলো । তাদের ধারণা ছিলো, রুশ সৈন্যরা প্রথমবারে মতো এবারও মার খেয়ে পালিয়ে যাবে । যেখানেই গিয়ে তারা আশ্রয় নিক, ওখানকার বাসিন্দারা তাদের নির্মূল করেই ক্ষান্ত হবে । কিন্তু ঘটেছে তার উল্টো ।

ইয়ারমুলুকের তীব্র আক্রমণের সময় কোহেস্তানী মার্দূলরা অবচেতনতার নিদ্রা থেকে কেবল জাগতে শুরু করেছে । তখন সময় গড়িয়ে পশ্চিমের আকাশে ঢলে পড়েছে । অথচ দাগেস্তানের আধ্যাত্মবিদ্যার প্রাণকেন্দ্র এরাগলে এক ইমাম বহু পূর্বেই তাদেরকে শত্রু থেকে সতর্ক হওয়ার কথা বলেছিলেন । তার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি । তাঁর দূরদৃষ্টি আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলো, প্রবল এক ঝঞ্ঝা সমাগত ।

এরাগল খানকা ছিলো এক প্রস্রবনধারা । পানি শস্যবীজ ও বন-বনানীকে সিঞ্চিত করে তাতে যেমন সুপুষ্টি ও সতেজতা জোগায়,ঠিক তেমনি এরাগল খানকাহ ছিলো জনমানুষের আত্মশক্তি অর্জনের একমাত্র প্রাণকেন্দ্র । এখানে নিয়মিত তালিম ও তরবিয়ত হতো ।

এখানকাকে ঘিরে আত্মশক্তিসম্পন্ন বহু মানুষ গড়ে উঠেছিলো । এর প্রধান পুরুষকে 'মোল্লা' সম্ভাষণে অভিহিত করা হতো । তার হাতে যারা সত্য প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতো, তাদেরকে বলা হতো 'ইমাম ' । প্রতিরক্ষা তৎপরতাকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল করার জন্য নিরাপদ অঞ্চল ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ছিলো । খান ও বেগ-এর মোকাবেলায় ইমাম এসব কাজে দিক নির্দেশনা দিতেন । মুজাহিদ এবং সাধারণ জনগণ ইমামের হাতে বায়আত গ্রহণ করতো ।

দুই.

উত্তর দাগেস্তানের পাহাড় - পর্বত ঘন সবুজের ঘেরা । কিছু পাহাড়ের চূড়া বরফে ঢাকা । দেখলে মনে হয় যেনো সবুজ চাদর পরিহিতি বিশাল এক আজব প্রাণী মাথায় সাদা পাগড়ি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে । দিনের বেলা সূর্যের কিরণমালা পাহাড়ের

'সিংহের একদিনের জীবন শিয়ালের শত বছরের জীবন অপেক্ষা উত্তম ।' মীরজাফর মীর সাদেক চরিত্রের লোকের অভাব হয় না । তারা পরিস্থিতির সঙ্গে কেবল আপোসই করে না, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দেশ, জাতি, রাষ্ট্রকে বিক্রিও করে দেয় । ইতিহাসের পাতায় ঘৃণার পাত্র ছাড়া এদের ঠাঁই নেই ।'

শীর্ষদেশ স্পর্শ করে প্রতিবিম্বিত হলে শূন্যে বাহারীরঙ ও আলোরমেলা বসে। পাহাড়ের পাদদেশগুলোকে বিশাল-বিস্তৃত ঝোপবিশিষ্ট মহিরুহ ঢেকে রেখেছে। এখানকার উপত্যকা, সমতল ও ঢালু অঞ্চল সবই সবুজ-শ্যামল। একটু পর পর কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। হঠাৎ মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। রোদ-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে দিনের সর্বক্ষণ। এই প্রখর রোদ, এই কালো মেঘের ঘন ছায়া। মেঘের ছায়া বৃক্ষরাজির ছায়াকে ঘোর অন্ধকারে পরিণত করে।

দু'টি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত ছোট্ট আরেকটিতে পাহাড়। এলাকার মানুষের কাছে তা 'তেলেসমাতি পাহাড়' নামে পরিচিত। পাহাড়টি বায়ু ও মেঘ চলার পথে অবস্থিত বলে এখানে সর্বক্ষণ শো শো শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপর দিয়ে কালো-সাদা-সুরমা বর্ণের মেঘমালা এভাবে অতিক্রম করে, যেনো মস্ত হাতি হেলে-দুলে পথ চলছে।

এই তেলেসমাতি পাহাড়ের ঢালুতে একটি আওল গড়ে ওঠেছে। নাম এরাগল। এখানে বাস করে প্রায় দু'শত পরিবার। পশ্চিম দিকে পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে বিশাল এক চত্তর। চত্তরের এক পার্শে মসজিদ। মসজিদের আঙিনাও বেশ প্রশস্ত। আঙিনার উত্তর-দক্ষিণে একটি হুজরা। মসজিদের চারপার্শ্বে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। উত্তরে বরফাবৃত পর্বতচূড়া। দক্ষিণে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রাকৃতিক সবুজ মখমলের চাদর বিছানো। যেদিকে চোখ পড়ে সবুজ আর সবুজ। গাছগাছালি এতো ঘন আর বিশাল বিশাল যে, মাত্র কয়েক পা দূরে অবস্থিত এরাগলের একটি ঘরও দেখা যায় না।

এক আল্লাহতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য এখানকার প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি বৃক্ষ ও তৃণলতা যেনো আল্লাহর পরিচয় লাভের এক একটি বাস্তব উদাহরণ। পাখ-পাখালির কিচিরমিচির শব্দকে তারা মহান আল্লাহর গুণকীর্তন বলে অভিহিত করে। কোনো লোক আল্লাহ কিংবা ইল্লাল্লাহু বলে চীৎকার করে ওঠলে তা পাহাড় ও বৃক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত গুঞ্জরিত হতে থাকে।

এরগলের মসজিদের খতিব এবং মাদ্রাসা-মকতবের হামিম ও মুদাররিস 'শায়খে দাগেস্তান' অভিধায় পরিচিত।

মুসলিম গোত্রগুলোতে বিবাহ-শাদী ইসলামী তরীকায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু কনের পিতা-মাতার বর হিসেবে বীর ছেলে আবশ্যক। কোনো কোহেস্তানী নারী কখনোই এ তিরষ্কার বরদাশত করবে না, তার স্বামী কাপুরুষ বা রণাঙ্গনের শাহসাওয়ার নয়। এ জনপদে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করার পূর্বে কনের পিতা-মাতা বর হিসেবে এমন দুরন্ত যুবককে বেছে নিতো, যে অন্তত নয়জন দুশমনের কর্তিত্ব হাত দ্বারা মালা গেঁথে ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে অহংকারে হেলেদুলে কনের বাড়ি আসতো। অন্যথায় বিয়ের পূর্বে বর কনের পিতাকে সামর্থ অনুযায়ী নয়টি ভেড়া বা নয়টি বকরী কিংবা নয়টি ঘোড়া অবশ্যই উপহার স্বরূপ প্রদান করতো।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আগত সেসব আল্লাহর বান্দাগণ এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রেখে যান, যাঁরা এখানকার অন্ধকারাছন্ন জনবসতিতে ইসলামের প্রদীপ হাতে আগমন করেছিলো। তাঁরা মানুষকে দুনিয়া ত্যাগের নয়-বিশ্বকে পদানত করার শিক্ষা দিতেন। এক আল্লাহ, এক রাসূল ও এক কিতাবের কথা বলতেন। জুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন, পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-মমতার দীক্ষা দিতেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

৬ এপ্রিল ২০১৩

আফগানিস্তানে মার্কিন জেট বিধ্বস্ত পাইলট নিহত

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে একটি মার্কিন জেট বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত হয়েছে যুদ্ধ বিমানটির পাইলট। বৃহস্পতিবার সামরিক অভিযান চালানোর সময় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিদেশি ন্যাটো বাহিনী এ খবর নিশ্চিত করেছে। ন্যাটো জানিয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানটির ধ্বংসাবশেষ ও নিহত পাইলটের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে, গতকাল আরও দুটি মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করেছে আফগানিস্তানের তালেবানরা। এ নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি মার্কিন বিমান ধ্বংস হলো।

এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলের ওয়ারদাক প্রদেশে একটি ড্রোন ধ্বংস হয়। ন্যাটো বাহিনী ড্রোন ধ্বংসের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি।

তবে ড্রোনটি ভূপাতিত করার দাবি করেছে তালেবানরা।

তারও আগে, আফগানিস্তানের তালেবান গেরিলারা আরও একটি মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করে। রাজধানী কাবুল থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তরে পারওয়ান প্রদেশের বাগরাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসন আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়েমেন ও সোমালিয়ায় ড্রোন হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমেরিকা দাবি করে আসছে, গেরিলাদের লক্ষ্য করে তারা ড্রোন হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা বলছে, ড্রোন হামলায় বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ হতাহত হচ্ছে।

৮ এপ্রিল ২০১৩

আফগানিস্তানে গাড়িবোমায় কূটনীতিকসহ ছয় মার্কিন নাগরিক নিহত

আফগানিস্তানে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে এক কূটনীতিক, তিন সেনা ও দুই মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরেকটি হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের অপর এক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

শনিবার এসব ঘটনা ঘটেছে বলে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি জানিয়েছেন।

তবে নিহত কূটনীতিকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জাবুল প্রদেশে এক গাড়ি বহর নিয়ে যাওয়ার সময় বহর লক্ষ্য করে গাড়িবোমা হামলা চালানো হয়। এতে কূটনীতিকসহ অন্যরা নিহত হন। তবে মোট কতজন নিহত হয়েছেন বিবৃতিতে তা জানানো হয়নি।

১২ এপ্রিল ২০১৩

সিরিয়ায় বিমান হামলার মূল লক্ষ্য ছিল বেসামরিক নাগরিক

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, চলমান সিরিয়া সংঘাতে সরকারি বাহিনী থেকে চালানো বিমান হামলার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ বেসামরিক নাগরিক। গতকাল এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি। উত্তর সিরিয়ার ৫২টি এলাকার ৫৯টি হামলার স্থান পরিদর্শন শেষে বিমান হামলায় প্রায় চার হাজার ২০০ বেসামরিক হত্যার ঘটনা নিশ্চিত করেছে এইচআরডব্লিউ। প্রতিবেদনে একটি বেকারি ও দুটি হাসপাতালসহ বেশ কিছু বেসামরিক স্থাপনায় বিমান হামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'আকাশ থেকে হত্যা' শিরোনামের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের গণহত্যার সঙ্গে জড়িত, তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত।

২৪ এপ্রিল ২০১৩

মিয়ানমারে 'নৃগোষ্ঠী নিধন' চলছে: এইচআরডব্লিউ

মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'নৃগোষ্ঠী নিধন অভিযানে' নেমেছে বলে অভিযোগ তুলেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটি বলেছে, হত্যা, নির্যাতন, নির্বাসন, জোর করে স্থানান্তরসহ নানা অপরাধের শিকার হচ্ছে রোহিঙ্গারা। এসব অপরাধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দেশটির কর্মকর্তা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সরাসরি জড়িত। তাঁরাই এসব অপরাধে নেতৃত্ব কিংবা উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে উসকে দিচ্ছেন।

২৫ এপ্রিল ২০১৩

আফগানিস্তানে নয় হেলিকপ্টার আরোহী অপহৃত

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় লোগার প্রদেশে গত রোববার জরুরি অবতরণ করেছে একটি বেসামরিক তুর্কি হেলিকপ্টার। ওই হেলিকপ্টারের নয়জন আরোহীকে তালেবানরা অপহরণ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রদেশের উপপুলিশের প্রধান রাইজ খান সাদিক বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা হেলিকপ্টারটি উদ্ধার করলেও এতে থাকা নয়জন আরোহীর কোনো সন্ধান পাননি। তালেবান জঙ্গিরা তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আরোহীদের মধ্যে সাতজন তুরস্কের ও দুজন রাশিয়ার নাগরিক।

২১ এপ্রিল ২০১৩

সামরিক বাজেটে দশম স্থানে সৌদি আরব

বিশ্বে যে ক'টি দেশের সামরিক বাজেট মাত্রাতিরিক্ত বা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে সেসব দেশের তালিকায় সৌদি আরবের অবস্থান দশম। সুইডেনের আন্তর্জাতিক শান্তি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসআইপিআরআই এই তথ্য দিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০১২ সালে রিয়াদের সামরিক বাজেট ছিল ৫ হাজার ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার। বিশ্বে সামরিক বাজেটের দিক থেকে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে আমেরিকা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন ও রাশিয়া। এরপর যথাক্রমে ব্রিটেন, জাপান, ভারত, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও সৌদি আরব।

২৫ এপ্রিল ২০১৩

বন্দিদের ওপর মার্কিন সেনাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে বিক্ষোভ

আফগানিস্তানের বালখ প্রদেশের জনগণ বেসামরিক মানুষ গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিদেশি সেনাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে সেদেশ থেকে ন্যাটো ও মার্কিন সেনা প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছে।

বিন লাদেনের সাবেক সহকারীর যাবজ্জীবন

আল কায়দার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী ওয়াহিদ আল হাজিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে আফ্রিকায় দুটি মার্কিন দূতাবাসে হামলাসহ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার দায়ে দ্বিতীয়বারের মতো তাকে এই দণ্ড দেয়া হয়।

চপেটাঘাত

 # ব্লাসফেমী আইনের দরকার নেই

বিবিসিকে শেখ হাসিনা, প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল, ১৩

- নিজের জন্য কবর খুড়বেন, এমন বোকা তিনি নন।

 # প্রধানমন্ত্রীর আপ্যায়ন খরচ গড়ে ২ লাখ ১৪ টাকা

আমার দেশ, ১০ এপ্রিল, ১৩

- শাহবাগের বিরিয়ানী সহ?

 # প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গণহত্যা হয়েছে তাকে ছাড়া হবে না

খালেদা জিয়া, নয়া দিগন্ত, ৫ এপ্রিল, ১৩

- ধরতেই তো পারলেন না এখনো, ছাড়ার আলাপ তো পরে

 # নববর্ষে সারাদেশ নিরাপত্তার চাঁদরে ঢাকা থাকবে

সরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, সমকাল, ১০ এপ্রিল, ১৩

- চাদরের নিচে বাঁদর-বাদরানিরা নাচবে বলে?

 # তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে

নারী সমাজসহ বিভিন্ন সংগঠন, প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল, ২০১৩

- রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেই এই আয়োজন।

 # লংমার্চ সম্প্রচারে মিডিয়ার কৃপণতা

আমার দেশ, ৭ এপ্রিল, ২০১৩

- লংমার্চকারীদের পেশাবে ভেসে যাওয়ার ভয়ে!

 # তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতেই আজকে হরতাল

২৭ সংগঠন, সমকাল, ৫ এপ্রিল, ১৩

- তরুন প্রজন্মের করুন হাল

বাড়ির পাশের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে রোজ। কি এক অজানা টান অনুভূত হয় এই পথটির প্রতি। মা থেকে পৃথক হওয়ার দিন এই পথ ধরেই নিয়ে এসেছিলো তাকে। মাকে খুব মনে পড়ে তার। মার ও কি মনে তাকে? দেখতে ইচ্ছে করে? আদর করতে ইচ্ছে করে কোলে নিয়ে? অই বাড়ির মেয়েটিকে কী আদর করে ওর মা! কোলো নিয়ে দোল দেয়। এরকম দোল খেতে ইচ্ছে করে সালামার।

পরাজিত যন্ত্রণা

সায়ীদ উসমান

উম্মে সালামা (রা.)

আহা! মেয়েটি কী যে সুন্দরী! টলমলে জলভরা চোখটি কী অদ্ভুত নীল। শিশুদের মতো মায়াবী তার হাঁটার ভঙ্গি। অসহায় ভাব ফুটে উঠে তার কদমে কদমে। তার সুন্দর মুখটি মেঘে মেঘে কখনো একাকার হয়ে থাকে। কখনো বিষন্নতার প্রলেপ লেপ্টে থাকে তার সরল মুখে। উদাস দৃষ্টি থেকে ছোপ ছোপ বেদনার ফোঁটা ঝড়ে পড়ে।

কে সে?

কোত্থেকে আসে সে এই উপত্যকায়? মদিনায় যাবার পথে মক্কার শেষ সীমায় এই মরু উপত্যকা। প্রতিদিনই সে আসে এখানে। ভোরে, সূর্য যখন উঠি উঠি করে, তখন সে আসে। এই উপত্যকায় বসে থাকে একা। এদিক সেদিক ঘুরেও বেড়ায়। উপত্যকার পাথুরে মাটি বুকে চেপে ধরে। প্রচন্ড আবেগ নিয়ে মাটিতে কি যেনো হাতড়ে ফেরে মাঝে মাঝে। কখনো সে কাঁদে গুণগুণ মিহি সুর তুলে। আবার কখনো শব্দ করে কাঁদে মেয়েটি।

বনু আব্দুল আসাদের বৃদ্ধ এক ব্যক্তি যেতেন মাঝে মাঝে এই উপত্যকার পাশ দিয়ে। দেখতে পেতেন মেয়েটিকে। আজো তিনি যাচ্ছিলেন এই পথে। দেখতে পেলেন দূর থেকে, শব্দ করে কাঁদছে মেয়েটি। কেমন যেনো দুঃখবোধ জেগে উঠলো তার ভেতর। এগিয়ে গেলেন তিনি মেয়েটির কাছে। গভীর মমতার স্বরে বললেন– ‘আচ্ছা মা, নাম কি তোমার?’

মেয়েটি কেঁদেই চলেছে। প্রশ্নটি কয়েকবার করার পর উত্তর দিলো সে– ‘উম্মে সালামা (রা.) আমার নাম।’ শুনে বিস্ময় ফুটে উঠলো বৃদ্ধের চেহারায়। ‘উম্মে সালাম তুমি? তোমার ঘটনা তো আমি জানি। তোমার গোত্র তোমাকে স্বামীর কাছে যেতে দিচ্ছে না, তাই না? আমি তোমার স্বামীর গোত্রের লোক। যাচ্ছি আমি তোমার গোত্রনেতাদের কাছে। দেখি কি করা যায় তোমার জন্য।’

বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁটা লাগালেন বৃদ্ধ মানুষটি।

হিজরত

ভোর। সূর্য উকি মারছে আকাশে। বাতাস দাপাদাপি শুরু করেছে কোরাইশদের মতোই। বৈরি বাতাসের চোখরাঙানি উপক্ষো করে আবু সালামা (রা.) উম্মে সালামাকে (রা.) বসিয়ে দিলেন উটের উপর। আদরের কন্যা সালামাকেও তুলে দিলেন মায়ের কোলে। উটের উপর মেয়েকে জড়িয়ে

ধরে উম্মে সালামা (রা.) বসলেন। সালামার বাবা, আবু সালামা (রা.) মিষ্টি করে হাসলেন মেয়ের গাল টিপে দিয়ে। বললেন–

'মা আমার! বসে থাকো আম্মুর কোলে।' সালামাও হাসলো বাবার দিকে তাকিয়ে। তিনজন মানুষের ছোটটো কাফেলা চলতে লাগলো পথ মাড়িয়ে। গন্তব্য বহুদূর, মদিনা। সালামার বাবা আবু সালামা (রা.) আগে আগে চলছেন উটের রশি ধরে। হাঁটার গতি প্রায় দৌঁড়ানোর কাছাকাছি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পেরিয়ে যেতে হবে মক্কার সীমানা। লোকালয় পেরিয়ে যেতে হবে অলি গলি জেগে ওঠার আগেই। নইলে দ্বীনের দুশমনেরা বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে হিজরতের পথে। কাফেলা নিরাপদে পেরিয়ে এলো কয়েকটি মহল্লা। সমানেই মক্কার শেষপ্রান্ত। সূর্য ততক্ষণে তাতিয়ে উঠেছে। বেলা চড়ে গেছে। বেড়ে গেছে মানুষের আনাগোনা। হঠাৎ সালামার মা, উম্মে সালামার (রা.) কপাল কুঁচকে উঠলো।

'ওগো,'

দূরে সামনে দিক থেকে আসতে থাকা কয়েকজন মানুষের দিকে তাকিয়ে স্বমীকে বলতে লাগলেন–

'ওগো, চেনা চেনা লাগছে ওদের। আমার গোত্রের মানুষ না তো ওরা?'

'তাইতো মনে হচ্ছে বিবি!'

উৎকণ্ঠা ঝড়ে পড়লো স্বামীর কণ্ঠেও। হাঁটার গতি সামান্য কমিয়ে দিলেন আবু সালামা (রা.)। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চললেন। সামনের দিক থেকে মানুষগুলো হেঁটে আসছে ধীরে। খুশমেজাজে গল্প করতে করতে। কাছিয়ে আসতেই মুখের মানচিত্র বদলে গেলো ওদের। বিষদৃষ্টিতে তাকালো আবু সালামার (রা.) দিকে।

'এই আবু সালামা, এতো আয়োজন করে যাচ্ছো কোথায় তোমরা?'

চোখে-মুখে মারমুখি ভঙ্গি ফুটে ওঠলো মানুষগুলোর।

'স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মদিনায় চলে যাচ্ছি।'

'তুমি মদিনায় যাচ্ছো যাও। কিন্তু তোমার স্ত্রী উম্মে সালামাকে (রা.) নিয়ে যেতে পারবে না।'

'সে আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রীকে আমি সাথে নিতে পারবো না?'

'না। পারবে না।

কারণ সে আমাদের মাখযুম গোত্রের মেয়ে। মদিনায় তোমার পরাজয় হলে আবার তাকে নিয়ে দেশান্তর হবে? আমাদের মেয়েকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে, এই অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?'

মক্কার মুশরিক জালেম মানুষগুলো আর অপেক্ষা করলো না। দেয়াল টেনে দিলো স্বামী আর স্ত্রীর মাঝে। উটের রশি কেড়ে নিলো আবু সালামার (রা.) হাত থেকে। ঠেলে ধাক্কিয়ে সরিয়ে দিলো তাকে। ছোটটো কন্যা সালামা কেঁদে উঠলো বাবাকে সরিয়ে দিতে দেখে। মায়ের কোল থেকে হাত বাড়িয়ে দিলো। যেতে চাইলো বাবার কাছে। বাবাও কেঁদে ফেললেন মেয়ের দিকে চেয়ে। শেষ বারের মত যেতে চাইলেন মেয়ের কাছে। অনুমতি চাইলেন একটু আদর করার। সেই ভাগ্য হলো না তার। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন অসহায় চোখে। জালেমরা তাকে টানতে টানতে সরিয়ে নিলো স্ত্রী-কন্যার সামনে থেকে।

'আবু সালামা (রা.), তুমি একা একা, সোজা চলে যাও মদিনায়। ফিরেও তাকাবে পেছনে।'

আবু সালামা (রা.) জীবনের ভয়ে রাসূলের ভালোবাসা আর আল্লাহর রহমতকে সঙ্গি করে হাঁটতে লাগলেন মদিনার পথে। স্ত্রী-কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায় ভাঙ্গছিলো তার মন। হৃদয়ের প্রতিটি কুঠুরি পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছিলো কষ্টের আগুনে। আবু সালামা (রা.) এভাবেই পুড়ে পুড়ে হয়ে উঠেছিলেন খাঁটি সোনা।

কন্যাহারা

আবু সালামাকে (রা.) রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলো জালেমরা। উম্মে সালামার (রা.) উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে চললো বনু মাখযুম গোত্রের দিকে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে মক্কার অলিতে গলিতে। আবু সালামার (রা.) গোত্র বনু আব্দুল আসাদ ক্ষেপে গেলো ঘটনা শুনে। রাস্তায় বেড়িয়ে এলো ওরা। পথরোধ করে দাঁড়ালো বনু মাখযুম গোত্রের মানুষগুলোর। বললো–

'তোমরা আমাদের পুত্রকে যখন পৃথক করে দিয়েছো তোমাদের কন্যা থেকে, তখন আমাদের পুত্রের কন্যাকেও তোমরা রাখতে পারবে না। আমাদের কন্যা থাকবে আমাদের কাছে। ওকে রাখার অধিকার আমাদেরই বেশি। মায়ের কোল থেকে সালামাকে ছিনিয়ে নিতে চাইলো ওরা। শুরু হলো টানাটানি। জোরজুরি। বনু আব্দুল আসাদের লোকেরা শেষে ছিনিয়েই নিলো নিষ্পাপ মেয়েটিকে।

স্বামী হারিয়ে একা হওয়ার পর একমাত্র কন্যার বিচ্ছেদ তাকে নিঃস্ব করে দিলো। চোখের সামনেই তছনছ হয়ে গেলো জীবন নামের সাজানো বাগান। কষ্টের অথৈ দরিয়া জীবন্ত ঢেউয়ের তোড়ে ভাসিয়ে নিলো তার জীবনের দুকূল। বনু আব্দুল আসাদের লোকেরা চলে যেতে লাগলো সালামাকে নিয়ে। অসহায় মা উম্মে সালামা (রা.) শুধু তাকিয়ে থাকলেন মেয়ের দিকে। নির্বাক, নিস্তব্দ তিনি। অগুনতি নি:শব্দ হাহাকার ঝড়ে পড়তে লাগলো বাঁধভাঙা অশ্রু হয়ে। তিনি তাকিয়ে থাকলেন কন্যার চলে যাওয়া পথের বাঁকে। যতোক্ষণ দেখা গেলো, তিনি তাকিয়েই থাকলেন।

মুক্তি

বনু মাখযুম গোত্রের গোত্রপতিদের বাড়ির সামনে এসে থামলেন বৃদ্ধ। খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে নিলেন। মনের ভেতর গুছিয়ে নিলেন বক্তব্য। তারপর হাঁক ছাড়লেন গোত্রপতিদের উদ্দেশ্যে। গোত্রপতিদের কয়েকজন বেরিয়ে এলো হাঁক শুনে। মেহমান খানায় বসালো বৃদ্ধকে, সম্মানের সাথে।

'তা কি ব্যপার?'

বললো বনু মাখযুম গোত্রপতিদের একজন। নড়েচড়ে বসলেন বৃদ্ধ। জড়তা ভেঙে বললেন–

'বেচারি উম্মে সালামাকে (রা.) তোমরা কি ছেড়ে দিতে পারো না? বছর হতে চললো, স্বামী আর কন্যাছাড়া দিন কাটছে তার।'

উপচে পড়া দরদ আর আকুতি প্রকাশ পেলো বৃদ্ধের কন্ঠে।

'না তাকে ছাড়া যায় না। সে বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে।'
বললো কনিষ্ঠ এক গোত্রপতি।
'তা দিয়েছে। দেশান্তরি হয়ে এর শাস্তিও সে মাথায় পেতে নিচ্ছে। জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার চাইতে বড় আর শাস্তি কি বলো? তাকে স্বামীর কাছে যেতে দিলে কি ভালো হয় না?'
আবারো মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কনিষ্ঠ এক গোত্রনেতা। তাকে থামিয়ে দিলেন বয়স্ক একজন।
'ঠিক আছে। সে মুক্ত। চলে যাক সে মদিনায়।'
'কিন্তু তার কন্যাতো আমাদের গোত্রে, বনু আব্দুল আসাদের কব্জায়।'
বৃদ্ধ বললেন অকপটে। অপরাধী অপরাধী ভাব ফুটে উঠলো তার চেহারায়।
'আমরা সবাই গিয়ে মুক্ত করার চেষ্টা করবো তার কন্যাকে। কি মনে হয়, তোমাদের গোত্র মুক্তি দিবে তাকে?'
বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো বনু মাখযুম গোত্রপতিরা।
'চেষ্টাতো করে দেখবো, চলুন যাই।'
বনু মাখযুম গোত্রপতিরা হেঁটে চললেন বৃদ্ধের পিছু পিছু।

নিরাপদ ঠিকানা

সালামা। চার কি পাঁচ বছরের শিশুকন্যা। বাড়ির পাশের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে রোজ। কি এক অজানা টান অনুভূত হয় এই পথটির প্রতি। মা থেকে পৃথক হওয়ার দিন এই পথ ধরেই নিয়ে এসেছিলো তাকে। মাকে খুব মনে পড়ে তার। মার ও কি মনে তাকে? দেখতে ইচ্ছে করে? আদর করতে ইচ্ছে করে কোলে নিয়ে? অই বাড়ির মেয়েটিকে কী আদর করে ওর মা! কোলো নিয়ে দোল দেয়। এরকম দোল খেতে ইচ্ছে করে সালামার। চোখ বুজে মনে মনে দোল খায় মায়ের কোলে। ইদানিং রাতে আর ঘুম হয় না ওর। ঘুমোলেই মা ভেসে উঠেন চোখে। ও দেখে–
একদল মানুষ ঘরের ভেতর বন্দি করে রেখেছে তার মাকে। শুধু ছোটটো জানালা দিয়ে দেখা যায় মায়ের কাপড়। দৌড়ে মায়ের কাছে যেতে চায় সালামা। পথে কিসের সাথে যেনো হোঁচট খায় আর ঘুমটা ধুম করে ভেঙ্গে যায় ওর।
আজ কি মনে করে পথে এসে দাঁড়ালো সালামা। তাকিয়ে থাকলো যতদূর দেখা যায়। তাকিয়েই থাকলো। হঠাৎ দূরে দেখতে পেলো মানুষের ছায়া। এগিয়ে আসছে। হাঁটার ভঙ্গিটা চেনা চেনা। কেমন যেনো শিহরণ বয়ে গেলো ওর ভেতর। আরো কাছিয়ে এলো মানুষটি। এবার তার অবয়বটি স্পষ্ট হলো সালামার কাছে। সুখের অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয় পড়লো মনের কোনে। চাপ চাপ সুখ যেনো ছুয়ে গেলো তাকে। মনের গভীর থেকে বেরিয়ে এলো মায়াবী শব্দের গুঞ্জরণ।
'মা! আমার মা!'
কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন উম্মে সালামা (রা.) পাখির ছানার মতো উড়ে এলো সালামা। ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে। খাঁচায় বন্দি পাখি যেনো খুজে পেলো নিরাপদ ঠিকানা।

মদিনার পথে

উটে চড়ে বসলেন উম্মে সালামা (রা.)। কোলো তুলে নিলেন কন্যা সালামাকে। আল্লাহকে সঙ্গি করে বেরিয়ে পড়লেন মদিনার পথে। মক্কায় দেরি করা উচিৎ মনে করলেন না মোটেও। কোনো সফর সঙ্গির জন্য অপেক্ষাও করলেন না। আবার কোনো ঝড় এসে যদি তছনছ করে দেয় সব! নানান ভয় আর আশঙ্কা হানা দিলো তার মনে। তড়িঘড়ি করে তাই বেরিয়ে পড়েছেন মদিনার পথে। দ্রুত উট হাঁকিয়ে চলে এলেন 'তানঈমে'। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে এই মহল্লা। এখানে এসে দেখা হলো হযরত উসমান (রা.) এর সাথে। তিনি তখনো আলোর সন্ধান পান নি। ইসলামের আলোয় স্নাত হন নি তখনো। তাকে দ্রুত চলতে দেখে বললেন–
'কি হে যাদুর রাকিব, মুসাফিরর পাথেয় এর কন্যা, যাচ্ছো কোথায়?'
'হিজরত করছি মদিনায়। আমার স্বামীও ওখানে।'
ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন উম্মে সালামা (রা.)।
'তোমার সঙ্গে কি কেউ নেই?'
উৎকণ্ঠা ঝরে পড়লো উসমান (রা.)-র গলায়। উম্মে সালামা (রা.) মনে দৃঢ়তা আনলেন। কণ্ঠেও ঝরে পড়লো তার রেশ।
'আমার আল্লাহ আছে আমার সাথে। আর আছে আমার কন্যা সালামা।'
'কসম রবের! তোমাকে একা যেতে দেয়া উচিৎ নয়। মদিনা পর্যন্ত আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'
উসমান (রা.) উম্মে সালামা (রা.)-র উটের লাগাম তুলে নিলেন হাতে।
আগে আগে চলতে লাগলেন তিনি।
ইতিহাস সাক্ষী!
উসমান (রা.)-র মতো এতো মর্যাদাপূর্ণ সম্ভ্রান্ত ভদ্র মানুষ সম্ভবত আসেনি পৃথিবীতে। যাত্রাবিরতীর প্রয়োজন হলে উসমান (রা.) উটকে বসাতেন। তারপর সরে যেতেন দূরে। উম্মে সালামা (রা.) নেমে কাপড় পরিপাটি করার পর কাছে আসতেন তিনি। উটটিকে বাঁধতেন কোনো গাছের সাথে। যাত্রা বিরতি শেষ হলে উটটি দাঁড় করাতেন। তারপর সরে যেতেন গাছের আড়ালে। বলতেন–
'উঠে পড়ুন উম্মে সালামা (রা.)।'
উম্মে সালামা (রা.) উঠার পর আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন উসমান (রা.)। লাগাম হাতে নিয়ে চলতে শুরু করতেন মদিনার পথে।
এভাবে চলতে চলতে মদিনার দু'মাইল দূরে কুবার নিকটবর্তি আমর ইবনে আউফ (রা.)-র মহল্লায় আসার পর থেমে গেলেন তিনি। বললেন–
'তোমার স্বামী রয়েছেন এই মহল্লাতেই। আল্লাহর নামে চলে যাও তুমি।'
ফিরতি পথ ধরলেন উসমান (রা.)।

মহামিলন

দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে এলো মিলনের মুধুলগ্ন। দেখা হলো স্বামী-স্ত্রীর। পিতা-কন্যার।
সুখের হাজারো কপোত উড়তে লাগলো তাদের হৃদয় অন্দরে। বুকের মধ্যে জমে থাকা কষ্টের পালকগুলো উড়ে উড়ে চলে গেলে দূরে, অন্যখানে। চাপ চাপ খুশির রঙবর্ণ হৃদয়ে বইয়ে দিলো এক ভুবনজয়ী সুখের ঝর্ণা। না পাওয়ার সব যন্ত্রণা আজ পরম পাওয়ার সুখানুভূতির কাছে পরাজিত হলো নিমিষেই।

আমীরুল মুমিনীনের ফরমান

ভাষান্তর : আব্দুল কাদির

বিশ্ববাসীর কাছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুজাহিদীনদের হেয় করার জন্য নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে বিশেষ মহল। বিশেষতঃ তালেবান মুজাহিদীনরা নারীশিক্ষা বিরোধী বলে প্রোপাগান্ডার ঝড় বইয়ে দিচ্ছে তারা। সম্প্রতি এ সব প্রোপাগান্ডার জবাবে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর হাফিজাহুল্লাহ এক বিবৃতি প্রদান করেন। 'আত তিবইয়ান' পাঠকদের জন্য তা হুবহু তুলে ধরা হলো –

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমার (হাফিজাহুল্লাহ) এর ফরমান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান শিক্ষার্জনকে স্বজাতীর ইহকালিন উন্নতি এবং পরকালীন সৌভাগ্যের সোপান মনে করে। আপনাদের হয়তো জানা থাকার কথা যে, ইমারতে ইসলামিয়া ক্ষমতায় থাকার সময়ে বাজেটের বিরাট একটি অংশ শিক্ষা খাতের জন্য নির্ধারণ করত এবং বর্তমানেও তারা নিজেদের কর্মসূচীতে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করে রেখেছে। যেনো সাধারণ জনগণ সহজেই শিক্ষা সুবিধা পেতে পারে। এতদসত্ত্বেও বহুবার দেখা গেছে, কিছু স্কুল বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, কিছু স্কুল জালিয়ে দেয়া হচ্ছে বা ছাত্রীদের উপর এসিড প্রয়োগ করে মুজাহিদীনদের ঘাড়ে এর দায় চাপিয়ে তাদেরকে অপমানিত করা হচ্ছে বা ছাত্রীদের উপর এসিড প্রয়োগ করে মুজাহিদীনদের ঘাড়ে এর দায় চাপিয়ে তাদেরকে অপমানিত করা হচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে এসকল ঘৃণ্য কাজ পরাজিত শত্রু বাহিনীর গোপন ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ। মানুষের চোখে মুজাহিদীনদেরকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এ সকল ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। আমরা ইসলামী মূলনীতি, জাতীয় স্বার্থ এবং ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে নারীদের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমেরিকার অনৈতিক আগ্রাসনের সাথে সাথেই আফগান জনসাধারণ বিশেষ করে নারী সমাজকে অগনিত বিপদ এবং কষ্ট বরদাশত করতে হয়েছে। এমনকি অনেক মেয়েরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়েছে আবার কাউকে অসহ্য নির্যাতন করার পর শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তাদের ইজ্জত আব্রু ভুলুন্ঠিত করা হয়েছে এবং আজ অবধি লাগাতার এই নির্যাতনের ধারা বন্ধ হচ্ছে না। অথচ 'ইমারাতে ইসলামিয়া' ক্ষমতায় থাকার সময়ে আফগান নারীরা নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করছিল এবং সকল মুসিবত থেকে নিরাপদ ছিলো।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপত্র মাসিক শরিয়ত (উর্দু) এর রবিউস সানী ১৪৩৪ হিজরী থেকে অনূদিত।

সূত্র:
http://www.theunjustmedia.com/Afghanistan/Mujahideen%20operations/March13/shariat-12.pdf

জিহাদের প্রত্যেক পর্বেই মুজাহিদীনদের অনেক দায়িত্ব আছে !!

জায়েদ বিন হারিস

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ । ওয়াস সালাতু ওয়াসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ।

অনেকেই জিহাদ বলতে খুব সাদা-মাঠাভাবে কিছু মানুষ জড়ো করে, তাদেরকে কিতালের ব্যাপারে তাহরীদ করে, জিহাদের ব্যাপারে কিছু আয়াত-হাদিস মুখস্থ করিয়ে – একসাথে 'কিছু একটা' করা মনে করে থাকেন । আমাদেরকে এই 'কিছু একটা' এর গভিরে যেতে হবে ।

বাস্তবে জিহাদ কিভাবে করতে হবে - তা জানতে হবে ।

কিভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুজাহিদীনরা জিহাদ করছেন - সেটা জানতে হবে ।

তা না হলে এই 'কিছু একটা' এর ব্যাপারে ভাসাভাসা ধারনা নিয়ে কাজ করতে গেলে, আমরা এই জমীনের জিহাদকে হয়তো আরো অনেক পিছিয়ে দিবো । আর আমরা সেটা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এবং সকল ব্যাপারে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করি ।

শায়খুল মুজাহিদ ইমাম আব্দুল্লাহ আজ্জাম (র.) বলেছেন– (আল-আন্দালুস মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত আলজেরিয়ার মুজাহিদীনদের সাম্প্রতিক ভিডিওতে এই বক্তব্য এসেছে)

জিহাদ চারটি পর্বের সমন্বয়ে গঠিতঃ

ক. **হিজরত**

খ. **ইদাদ বা প্রস্তুতি**

গ. **রিবাত**

ঘ. **কিতাল**

তিনি আরো বলেছেন–
'ইদাদ ছাড়া কিতাল করা সম্ভব নয় ।
রিবাত ছাড়া কিতাল করা সম্ভব নয় ।'

তবে প্রত্যেক মুজাহিদকেই আলাদাভাবে এই চারটা পর্বে কাজ করতে হবে এমনটা নয় । এটা হলো সাধারণভাবে যে কোনো জিহাদের জন্য পর্ব । মুজাহিদীনদের একদল এগুলো করলেই হবে ইনশাআল্লাহ । যেমন–

ক. হিজরত

মক্কার মুহাজিররা হিজরত করেছিলেন, কিন্তু মদীনার আনসাররা হিজরত করেন নি । তারা হিজরত করতে সহায়তা করেছেন । তারা দিয়েছেন নুসরত । মদীনার আনসাররা আনসার হবার পরেই কেবল মক্কার মুহাজিরদের জন্য হিজরত করা সম্ভব হয়েছে । আল্লাহ তাঁদের সবার উপর রাজী থাকুন ।

আবার হিজরত করতে হলে যে বর্তমান একদেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হবেই - এই চিন্তাধারাও যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে ।

এসব বর্ডার তো মাত্র সেদিন ব্রিটিশ কাফির-ক্রুসেডাররা যাবার সময় এঁকে দিয়ে গেছে ।

এছাড়া মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব হয়তো টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এর দূরত্বের কাছাকাছি হতে পারে । তাহলে বড় যেকোন দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে গেলেতো এর চেয়ে বেশী দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে ।

তাই বুঝা যায়, হিজরত মূলত নিজের দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য অন্যত্র চলে যাওয়া । সেটার দূরত্ব নির্দিষ্ট নেই । একই দেশের ভিতরে হিজরতের ব্যাপারে ইমাম আনোয়ার আওলাকী (রঃ) তাঁর 'হিজরত' লেকচারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।

এছাড়া অনেক সময়, একই দেশে থেকেও অনেক মুজাহিদ নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য হন । সেটাও হিজরত হতে পারে । আল্লাহই ভালো জানেন ।

আমরা বর্তমানে মক্কার মুহাজির না হয়ে মদীনার আনসারদের ভূমিকায় থাকতে পারি । তাহলেও জিহাদের প্রথম পর্বে আমাদের অংশগ্রহণ থাকলো ইনশাআল্লাহ ।

এটাই বর্তমান যুগের জিহাদের মূল স্রোত । সবাই জিহাদের জন্য নুসরত দেয়ার চেষ্টা করছেন । সবাই আনসার হবার চেষ্টা করছেন । যেমনঃ আনসার আশ শারীয়াহ, আনসার আদ দ্বীন,

জাবহাত আল নুসরাহ। খোরাসানের তালেবান মুজাহিদীনগণ, যারা এই যুগের জিহাদের সূতিকাগার হিসেবে কাজ করছেন, তারাও আরব মুজাহিদীনদেরকে নুসরত দিয়েছেন।

তাই আমাদের সবার আনসার হওয়া উচিত। আমরা যেভাবে নিজের জান-মাল-সন্তানদেরকে রক্ষা করি, সেভাবে মুজাহিদীনদেরকে রক্ষা করা উচিত। নিজের ঘরে তাদেরকে জায়গা দেয়া উচিত। যাতে তারা জিহাদের কাজ সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন।

এছাড়া এদেশ থেকে সবাই হিজরত করে অন্য দেশে চলে গেলে এই দেশে মুর্তাদদেরকে হটিয়ে ইসলামী শরীয়াত কায়েম করবে কারা? এ দেশ তো তাহলে আজীবনের জন্য মুর্তাদদের দখলে থেকে যাবে। আমাদের এলাকার মুজাহিদীনরা জিহাদে শরীক না থাকলে অন্য দেশের মুজাহিদীনরা এসেতো এখন বাংলাদেশকে তাগুত-মুর্তাদদের থেকে উদ্ধার করে দিবেন না। আমাদের এলাকা আমাদেরকেই সামাল দিতে হবে।

এমনিতেও এখানে শরীয়াতের পুনঃবিজয় করা ইজমা অনুযায়ী আমাদের উপর ফরজে আইন।

তাই, আমরা নিজেরা আনসার হয়ে এদেশে মজলুম মুসলমান ও মুজাহিদীনদেরকে হিজরত করে আসার সুযোগ দেয়া উচিত।

খ. ইদাদ

ইমাম আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রঃ) আরো বলেছেনঃ
'প্রতিটা ঘন্টা কিতালের জন্য রয়েছে হাজারো ঘন্টার প্রস্তুতি'।

'জিহাদের প্রস্তুতি চলে মাসের পর মাস। কিন্তু কিতাল চলে অল্প সময়ের জন্য। মাসে একদিন কিংবা দুই মাসে একদিন।'

সত্যি, যুদ্ধের জন্য কুফফারদের প্রস্তুতি দেখলে ইমাম আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রঃ) এর কথার মাহাত্ম বুঝা যায়। ইরাক যুদ্ধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কুফফারও কয়েক মাস ধরে মধ্যপ্রাচ্যে লজিষ্টিক সাপোর্ট সঞ্চয় করেছে। কিন্তু সেখানে তাদের যুদ্ধ চলেছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

অর্বাচীনরাই কেবল জিহাদের এই পর্বে তাড়াহুড়ো করে সকল প্রস্তুতির কাজ বিনষ্ট করে চাইবে।

বোকারাই কেবল সবরের অভাব হেতু এই পর্বে কাজ করতে চাইবে না।

আর বাস্তবিক এই পর্বের কাজ খুবই কষ্টকর। কারণ চোখের সামনে কোনো সুস্পষ্ট ফলাফল এই পর্বে দেখা যাবে না। হয়তো মুজাহিদ উমারা শুধু এই পর্বে সার্বিক প্রস্তুতির অগ্রগতি বুঝতে পারবেন। হয়তো নিরাপত্তার স্বার্থে তারা সকল মুজাহিদীনদের সাথে এই অগ্রগতি নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনাও করবেন না।

এই পর্ব হলোঃ শ্রবণ ও আনুগত্যের পরীক্ষার এক পর্ব। কারণ অনেক সময় হাতে অস্ত্র থাকবে, সুযোগ থাকবে কোনো অপারেশন করার, কিন্তু সার্বিকভাবে ইদাদ শেষ না হওয়ায় হয়তো অপারেশনের অনুমতি মিলবে না। একমাত্র মুজাহিদীন উমারা ভালো বুঝবেনঃ এখন কি অপারেশন করার মতো সামর্থ্য মুজাহিদীনদের জামায়াত অর্জন করেছে কিনা। কারণ তারা সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপারে জানবেন।

ইদাদ পর্বের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন - ততটুকু সময়ই নেয়া দরকার। এর চেয়ে কম সময়ে কাজ করতে গেলে প্রস্তুতি ঠিকমতো না নিয়ে অপারেশন শুরু করে দিলে, যে কোনো জিহাদী তানজিমের জন্য তাদের মঞ্জিলে পৌঁছা কষ্টকর হয়ে যাবে।

অর্ধেক প্রস্তুতি নিয়ে কিতাল শুরু করে দিলে হয়তো নিম্নশ্রেণীর কিছু মুর্তাদ পুলিশ কিংবা সৈনিককে কতল করা যাবে, কিন্তু জিহাদের মূল মাকসাদ হাসিল করা কষ্টকর হয়ে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো ঐ মুজাহিদীনরা সাফল্য লাভ করবেন, কিন্তু এই অঞ্চলের মুসলিমদের পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা তখন থাকবে না।

এই পাঁচ-সাত বছর আগে ইয়েমেন, মালি, সিরিয়াতে রিবাত/কিতাল পর্ব শুরু হবার আগে এসব দেশের মুজাহিদীনরা এই ইদাদ বা প্রস্তুতি পর্বে কাজ করছিলেন।

এই ইদাদ পর্ব ব্যক্তিগতভাবে সকল মুজাহিদ নাও পেতে পারেন। যেমনঃ এদেশে যদি এখন জিহাদের কিতাল পর্ব চলতো তাহলে নতুনভাবে জিহাদের পথে কেউ আসলে হয়তো ইদাদ কিংবা রিবাত পর্ব উনি পেতেন না। যদিও ব্যক্তিগতভাবে উনাকে কিছু কিছু বিষয় শিক্ষা করতে হবে।

গ. রিবাত

এটা মূলতঃ উভয় পক্ষ একে অন্যকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখার পর্ব। এই পর্বে মুজাহিদীনরা ছোট ছোট অপারেশন শুরু করেন কিন্তু পুরো একটা এলাকা

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে জিহাদের নামে 'কিছু একটা' না করে, সঠিক পদ্ধতিতে জিহাদ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে 'পিছনে বসে থাকার নিফাকী' থেকে দূরে রাখেন এবং জিহাদের জন্য 'তাড়াহুড়া প্রবণতা' থেকে দূরে রাখেন। তিনি যেন আমাদেরকে এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী সঠিক অবস্থানে থেকে জিহাদ করার তৌফিক দান করেন। একমাত্র তিনিই সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া সঠিক পথ প্রদর্শনকারী আর কেউ নেই।

সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্বে নেয়ার মতো শক্তি তখনো অর্জিত হয় না।

এই পর্বে মুজাহিদীনরা নিজেদের 'ব্যানার' প্রকাশ করেন। তাদের নির্দিষ্ট সংবাদ প্রকাশক (Spokesman) কাজ করা শুরু করেন। এই পর্বে মুজাহিদীনরা মাঝে মাঝে মিডিয়ায় অডিও-ভিডিও বার্তা পাঠান। তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বার বার সাধারণ মুসলমানদের কাছে পরিস্কার করতে থাকেন।

এই পর্বে মুর্তাদ-কাফিরদের ক্ষতি সাধন করে মুজাহিদীনরা তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেন। এটা দেখে সাহসী মুসলমান যুবকরা মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দিতে থাকে। আবার মুর্তাদ-কাফির বাহিনীও মুজাহিদীনদের উপর মাঝে মাঝে আক্রমণ চালায়। এটা অনেকটা কিতাল পর্বের জন্য একটা সূচনা পর্বের মতো কাজ করে।

পাকিস্তানের শহরাঞ্চলে যে রকম জিহাদ চলছে, এই পর্ব অনেকটা সে রকম। ইরানের মুজাহিদীনদের অবস্থাও এ রকম। ইয়েমেনের মুজাহিদীনরা কিছুদিন আগেও (আবইয়ান অঞ্চল দখলে নেবার আগে) এই পর্বে ছিলেন।

এ পর্বও সকল মুজাহিদ নাও পেতে পারেন। অনেকে ইদাদ পর্বে শহীদ হয়ে যেতে পারেন। অনেকে কিতাল পর্বে এসে যোগ দিতে পারেন।

কিন্তু একটি এলাকার জিহাদকে এই পর্ব অতিক্রম করতে হবে।

শায়খুল মুজাহিদ ইমাম আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রঃ) বলেছেনঃ (আল-আন্দালুস মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত আলজেরিয়ার মুজাহিদীনদের সাম্প্রতিক ভিডিওতে এই বক্তব্য এসেছে)

জিহাদ চারটি পর্বের সমন্বয়ে গঠিতঃ
হিজরত

ইদাদ বা প্রস্তুতি

রিবাত

কিতাল

তিনি আরো বলেছেনঃ
'ইদাদ ছাড়া কিতাল করা সম্ভব নয়। রিবাত ছাড়া কিতাল করা সম্ভব নয়।'

তবে প্রত্যেক মুজাহিদকেই আলাদাভাবে এই চারটা পর্বে কাজ করতে হবে এমনটা নয়। এটা হলো সাধারণভাবে যে কোন জিহাদের জন্য পর্ব। মুজাহিদীনদের একদল এগুলো করলেই হবে ইনশাআল্লাহ।

ঘ. কিতাল

এই পর্বে মুজাহিদীনরা সরাসরি কিছু এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেন। কাফির-মুরতাদ বাহিনীর সাথে অনেক ক্ষেত্রে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। অনেক সময় সনাতনধর্মী সামরিক অভিযান চালাতে হয়।
সোমালিয়া ও আফগানিস্তানের জিহাদ এখন কিতাল পর্বে রয়েছে বলে আমরা ধারনা করতে পারি।

অনেক মুজাহিদ হয়তো রিবাত কিংবা ইদাদ পর্বে শহীদ হয়ে যেতে পারেন, তাই এই পর্বও সবাই নাও পেতে পারেন।

মূলকথা: এই পর্বগুলো সামষ্টিকভাবে একটা জিহাদ অতিক্রম করবে।

আমরা নিজেরা যে পর্বেই থাকি না কেনো, সে পর্বের কাজ সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া মানেই হলোঃ আমরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাতে ঠিক মতো সামিল আছি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিতাল পর্ব থেকে ইদাদ পর্ব আরো বেশি কষ্টকর হয়, তাই আরো বেশি সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। কারণ ইদাদ পর্বে একদল মুজাহিদের প্রস্তুতির কাজ আঞ্জাম দেবার ফলেই কিতাল পর্বে শতশত মুজাহিদীন জিহাদে শরীক হবার সুযোগ পান। অনেকে শহীদ, অনেকে গাজী হবার সুযোগ পান। একটি মসজিদ নির্মানের সাথে জড়িত থাকা যদি সদকায়ে জারিয়া হয়, তাহলে একটি জিহাদের ময়দান প্রস্তুত করার কাজ সদকায়ে জারিয়া হবে না কেনো?

অনেকে ইদাদ পর্বের সময়ে প্রস্তুতির কাজকে 'পিছনে বসে থাকা' কিংবা 'জিহাদের পথে না থাকা' হিসেবে চিন্তা করেন, যা তাদের দূরদর্শীতা ও ইলমের অভাব থেকে তৈরি হয়। আমরা যেনো এ রকম মানুষের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত না হই।

আল্লাহ যেনো আমাদের সবাইকে জিহাদের নামে 'কিছু একটা' না করে, সঠিক পদ্ধতিতে জিহাদ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ যেনো আমাদেরকে 'পিছনে বসে থাকার নিফাকী' থেকে দূরে রাখেন এবং জিহাদের জন্য 'তাড়াহুড়া প্রবণতা' থেকে দূরে রাখেন। তিনি যেন আমাদেরকে এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী সঠিক অবস্থানে থেকে জিহাদ করার তৌফিক দান করেন। একমাত্র তিনিই সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া সঠিক পথ প্রদর্শনকারী আর কেউ নেই।

জাযাকাল্লাহু খাইরান।

কেন আমাদের ভূমিতে জিহাদ তথা কিতাল আমাদের নিকট অধিক প্রাধান্য ?

মিকদাদ সুলাইমান

সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালক আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মুজাহিদরা যুদ্ধ করে যুগে যুগে, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর দূত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যার সারা জীবন ছিল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিত।

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় কেন আমাদের জন্য আফগানিস্তান বা ইরাকে জিহাদ/ কিতাল করার চাইতে এই ভূমিতে অর্থাৎ বাংলাদেশে জিহাদ/ কিতাল অধিক প্রাধান্যযোগ্য। আমি লেখাটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করছি-

১) শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং

২) কৌশলগত দৃষ্টিকোণ তথা বাস্তবতা থেকে

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে

আমাদের সময় জিহাদ বলতে কিছু সংখ্যক আলিম শুধু ইহুদী-নাসারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোঝাতে চান, অথচ হাদিসে মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদেরও তাগিদ আছে বরং ফকীহগণ মুসলিমদের ভূমিতে যে মুরতাদ শাসক ক্ষমতায় থাকে তার বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরযে আইন বলেছেন। শাসক যখন সুস্পষ্ট কুফরি করে তখন যাদের শক্তি আছে, তাদের উপর এটা ফরজে আইন হয়ে যায় যে, ঐ শাসককে প্রতিস্থাপন করা। এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা রয়েছে। উবাদা বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছেঃ 'তাদের (শাসকদের) সাথে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফর (কুফরুন বাওয়াহ) দেখতে পাও'। (সহীহ বুখারী)।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রঃ) 'শারহ সাহীহ মুসলিম' কিতাবে এবং ইমাম ইবনে হাজার

আসক্বালানী (রঃ) ফাতহুল বারীতে শাসক কুফর বাওয়াহ করলে সামর্থবানদের উপরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হবার উপর আলিমদের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, 'এমন প্রত্যেক দল যারা কোনো সুস্পষ্ট ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের ইমামদের ইজমা মতে ওয়াজিব যদিও তারা (কালেমা) শাহাদাহ পাঠ করে'। (মাজমু আল ফাতাওয়া, ২৮/৫১০)

অনেকে উবাদা বিন সামিত (রাঃ) এর হাদিসটি এভাবে বোঝাতে চান যে এখানে যে শাসকদের কথা বলা হচ্ছে তারা এমন শাসক যারা ইসলামী হুকুমাতকে সরিয়ে ইসলাম বিরোধী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের যুক্তি বাংলাদেশ বা এর আশেপাশের অঞ্চলে কখনই ইসলামী হুকুমাত ছিলনা। তাদের অবগতির জন্য আমাদের এই জমিনে পূর্ণভাবে ইসলামী হুকুমাত ছিল সর্বশেষ মুঘল বাদশাহ আলমগীর এর সময়ে। তার পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই যমীনে সর্বপ্রথম ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০৩ ঈসায়ী সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর আমলে। তিনি ছিলেন গজনীর সুলতান ঘুরির গভর্নর। কুতুবুদ্দিন আইবেকের সেনাপতি। সেই ইসলামী হুকুমাতের পুরোপুরি বিলুপ্তি ঘটে ইংরেজদের আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে। সেই ব্রিটিশদের দেওয়া হুকুমাত দিয়ে আজও আমাদের দেশ শাসিত। কাজেই এই ফরযে আইন জিহাদ কোনো নতুন বিষয় না; এটি ফরযে আইন হয়েছে আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে। আজ পর্যন্ত ব্রিটিশদের দেওয়া এই নোংরা আইনকে সরিয়ে এখানে ইসলামী হুকুমাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ব্রিটিশরা চলে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু যাওয়ার আগে তারা নিশ্চিত করে গেছে এবং এখনও করছে যেনো তাদের এজেন্ট এই দেশীয় মুরতাদরাই এদেশের ক্ষমতায় থাকে এবং তাদের দেওয়া পন্থায় এই দেশ শাসন করে।

আরেকটা ব্যাপার হলো যে সব ভাইরা এদেশে জিহাদকে কম গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি আফগানিস্থান, ইরাকে গিয়ে জিহাদে শরীক হবার কথা বলেন, তাদের যুক্তি হলো, সেখানে সরাসরি কাফিররা আক্রমণ করেছে তাই সেখানে জিহাদ ফরজে আইন। কিন্তু এই ভাইরা খেয়াল রাখতে ভুলে যান যে, এটা তখন হবে যখন সেই সব জিহাদে পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষের অভাব হবে। আলহামদুলিল্লাহ, সেসব জায়গায় মানুষের অভাব নেই বরং সেখানে বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দিষ্ট কোটা বরাদ্দ করা আছে এর চেয়ে বেশী সংখ্যক মুজাহিদীন তারা নিচ্ছেন না। এ থেকেই সেই সব জায়গায় জিহাদ ফরজে আইন থেকে ফরজে কিফায়া হয়ে যায়। কারন আমরা

সবাই চাইলেও সেখানে নেওয়া হবে না।

এই দেশে জিহাদ বেশি গুরুত্ব পাবে কেনো?

এখন যদি মনে হয়, দুটোই ফরজে আইন, তাহলে দুই ফরজে আইনের মধ্যে এই দেশে জিহাদ বেশী গুরুত্ব পাবে। কারণ

১। এসব মুরতাদ শাসকরা এবং ইহুদী-নাসারারা উভয়েই কাফির। বরং মুরতাদরা আসল কাফিরদের চেয়ে বেশি খারাপ। তাই এদের বিরুদ্ধে জিহাদ অগ্রগন্য। এরাও ইহুদী-নাসারাদের মতই মুসলমানদের ভূমিকে নিজেদের দখলে রেখেছে এবং এর সম্পদকে লুটপাট করছে। মুসলমানদের জানমাল তছনছ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অবস্থা দেখলে এটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

২। এসব মুরতাদরা আমাদের নিকটবর্তী এবং আমাদের বর্ণের। আল্লাহ আমাদেরকে নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে কিতালের তাগিদ করেছেন।

আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত তাওবা ৯:১২৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সীরাতের মাঝেও আমরা একই পদ্ধতি পাব। উনি নিজের বংশের কুরাইশ কাফিরদের সাথেই আগে কিতাল করেছেন এবং পরবর্তীতে রোম-পারস্যের সাথে কিতালে অগ্রসর হয়েছেন।

৩। ঐ ফরযে আইন পালন করার জন্যই এই ফরযে আইন পালন জরুরী। কারণ, এই দেশের মুরতাদ শাসকরা কখনই আমাদের কাশ্মীর, আফগানিস্তান বা আরাকানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দিবে না। বরং তারা যদি টের পায় আপনি এসব করতে চাচ্ছেন, আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের কারাগারে প্রেরণ করবে। এদের আচরণ আমাদেরকে আল্লাহর ঐ কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়–

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

'আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না করো, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।' (আল আনফাল ৮:৭৩)

কাজেই ঐসব ভূমিকে জিহাদের সহযোগিতার জন্যই আমাদের এই দেশে জিহাদ করা উচিত যাতে বেশী সংখক মুজাহিদ অংশ নিয়ে কাফিরদের আরও ভিত করতে পারে এবং তাদের মনোযোগকে শুধু আমাদের ঐসব ভাইয়ের দিক থেকে সরিয়ে আরও বিক্ষিপ্ত করতে পারে।

৪। এই দেশে জিহাদের জন্য উমারাদের নির্দেশনা।

মুজাহিদ উমারাদের পক্ষ থেকে আফগানিস্তান বা ইরাকের সকল জিহাদের ময়দান থেকেই ট্রেনিং নিয়ে আবার নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য মুজাহিদীনদেরকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারণ, জিহাদের নেতৃত্ব চাচ্ছেন, যাতে সকল দেশে জিহাদ ছড়িয়ে যায়। আমরা এই বিষয়ে শায়খ উসামা বিন লাদেন (তোরাবোরা পর্বতের সেই যুদ্ধের পরপর) এবং শায়খ মুস্তাফা আবু ইয়াজিদ (আল্লাহ এই দুইজনের শাহাদাত কবুল করুন) এর সরাসরি বক্তব্য দেখেছি যেখানে উনারা বলেছেন, তাঁরা এই জিহাদের ময়দানকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চান, যাতে কুফফারদের এই যুদ্ধ সামাল দেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া, শায়খ মুস্তাফা আবু ইয়াজিদের 'পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বার্তা' এই লেখায় আমরা দেখতে পাই উনি বাংলাদেশের কথাও নিয়ে এসেছেন। কারণ এই ভূখণ্ড হিন্দুস্থান থেকে পৃথক হওয়ার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব যার মূল আসলে আল্লাহর জন্য ভালবাসা আল্লাহর জন্য ঘৃণা এবং শরীয়ত। পাকিস্তান দ্বারা বুঝানো হত ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতা হোক সে বাংলাদেশী, পাঞ্জাবী, পাশতুন, সিন্ধী, বালুচী। এই লেখায় উনি সেই পাকিস্তান যা ভারত থেকে আলাদা হয়েছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর বাস্তবায়নের জন্য সেই লক্ষ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই ভূমিতে মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহবান জানান।

এই ভূমিতে জিহাদের ফযিলতের হাদিস কি অনুপস্থিত?

অনেকে আবার এই কথা বলে এই দেশ নিয়ে আমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোনো ভবিষ্যতবাণী নাই। এই প্রসঙ্গে দু'টি কথা বলতে চাই–

প্রথমত : কোনো জায়গা সম্পর্কে যদি ভবিষ্যতবাণী না থাকে তার মানে কি সেখানে কাজ করার কোনো গুরুত্ব নেই নাকি ভবিষ্যতবাণীর মাধ্যমে তাকদীর সম্পর্কে আমরা অবহিত হই? যদি ভবিষ্যতবাণীর অনুপস্থিতি ফরযিয়াতের অনুপস্থিতি বোঝায় তাহলে আলজিরিয়া, মালি, সুদান, সোমালিয়ার ভাইরা ভুলের মধ্যে আছেন বিষয়টা কি এইরকম? নাউযুবিল্লাহ! উনারা অবশ্যই ফরয খেদমতের মাঝে আছেন।

দ্বিতীয়ত : আমাদের এই ভারতবর্ষের যুদ্ধ অভিযান সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী আমরা ভুলে যাই–

৪৩৮২ - أنبأ أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأ عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سيار قال زكريا وأنبا به هشيم عن سيار عن جبير بن عبيدة وقال عبيد الله عن جبير عن أبي هريرة قال : وعدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوة الهند فإن أدركها أنفذ فيها نفسي ومالي فإن أقتل

كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر

[سنن النسائي]

- আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে হিন্দুস্থানে অভিযানের ওয়াদা করিয়েছিলেন। যদি আমার জীবদ্দশায় তা ঘটে তবে যেন আমার জান ও মাল এতে ব্যয় করি। যদি আমি এই যুদ্ধে নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদ হিসেবে পরিগণিত হবো। আর যদি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসি তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্ত আবু হুরাইরা হয়ে যাব।

২২৩৯৬ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْوُصَابِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمْ اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام

(مسند الإمام أحمد بن حنبل)

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আযাদকৃত দাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার উম্মতের দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন- একটি সেনাদল যারা হিন্দুস্থানে (ভারত উপমহাদেশ) অভিযান করবে অপর দলটি ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ) এর সাথে থাকবে। (মুসনদে আহমাদ)

অনেক ভাই আবার বলেন, এই অভিযান তো হয়েই গেছে অনেক আগে। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন তারা এই নিশ্চয়তা কোথা থেকে পেলো? আমরা জানি, লাইলাতুল কদরের ফযীলত অনেক যাকে বলা হয়েছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই রাতের কিছু লক্ষণও হাদিসে এসেছে; যেমন অল্প বৃষ্টি, সূর্যের তাপের প্রখরতার অনুপস্থিতি, ইত্যাদি। এখন কেউ যদি এসব দেখে বলে আমি তো লাইলাতুল কদর পেয়ে গেছি কাজেই আর রমযানের শেষ দশ দিনের অন্য রাতগুলিতে আমি আর একে খোঁজ করবনা; তাহলে কি আমরা কেউ এই ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান বলব?

কোন জায়গা সম্পর্কে যদি ভবিষ্যতবাণী না থাকে তার মানে কি সেখানে কাজ করার কোন গুরুত্ব নেই নাকি ভবিষ্যতবাণীর মাধ্যমে তাকদীর সম্পর্কে আমরা অবহিত হই? যদি ভবিষ্যতবাণীর অনুপস্থিতি ফরযিয়াতের অনুপস্থিতি বোঝায় তাহলে আলজিরিয়া, মালি, সুদান, সোমালিয়ার ভাইরা ভুলের মধ্যে আছেন বিষয়টা কি এইরকম? নাউযুবিল্লাহ! উনারা অবশ্যই ফরয খেদমতের মাঝে আছেন।

একইভাবে কেউ যদি বলে ভারতবর্ষে জিহাদী অভিযান শেষ আমরা এখন আর এখানে কিছুই করবনা সেটাও একই রকম বোকামি হবে। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলির সময়কে উহ্য রেখে মানুষ যেন সব সময় এই আমলগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকে সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন। এছাড়াও কোনো কোনো দুর্বল হাদিসে এসেছে, এই দুই সেনাবাহিনী (যারা ঈসা (আ) এর সাথে থাকবে এবং যারা ভারতবর্ষে জিহাদী অভিযানে অংশ নিবে) তাঁরা পরস্পর মিলিত হবে।
এই দেশে যদি বাংলাদেশের মুজাহিদীনরা দ্বীন কায়েমের জন্য মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তবে কি বাইরের কোনো দেশ থেকে হিজরত করে মুজাহিদীনরা এসে এখানে জিহাদী অভিযান করবে? আপনার এলাকায়, আপনার গ্রামের বাড়িতে, জেলায়, শহরে জিহাদ করার জন্য আপনার চেয়ে যোগ্য কে আছে? অপরিচিত কেউ এসে কি আপনার চেয়ে উত্তমভাবে এখানে জিহাদ করতে পারবে? কক্ষনো না।
কৌশলগত দৃষ্টিকোণ তথা বাস্তবতা থেকে

- আমরা যদি সারা বিশ্বে মারেকার সংখ্যা দেখি ১০ বছর আগে কতটি ছিল আর এখন কতটি আছে তাহলেই আমাদের কাছে সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে বর্তমান জিহাদের মানহাজ কি। ১০ বছর আগে যেখানে মারেকা ছিল বড়জোর দুইটি এখন বিশ্বে মারেকা ১০-১২ টি। আমাদের অনেক ভাই এখন আবার সিরিয়াতে/মালিতে হিজরতের স্বপ্ন দেখছেন। তাদের কাছে প্রশ্ন তাদের এখানে এই মারেকা কিভাবে সৃষ্টি হল? সেখানেও তো মুসলমানদের উপর যে কাফির/মুরতাদ শাসক ছিল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমেই এই ফসল এসেছে। সেখানে তো প্রথমেই কোনো ইহুদী-নাসারারা আক্রমণ করেনাই। আমরা কি শুধু তাহলে ফলবান বৃক্ষ থেকে ফল পেতে চাই? নাকি আমরা নিজেরাও গাছের চারা লাগিয়ে ফল পর্যন্ত গাছের যত্ন নিয়ে সেই ফল পেতে চাই?
- সবগুলো মারেকা/যুদ্ধক্ষেত্রের ধারণ ক্ষমতা আছে। জিহাদের ময়দানে একই সাথে অনেক মুজাহিদকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। বরং মুজাহিদীনদের ইমারাতের পক্ষ থেকে দেশ ভিত্তিক কোটা নির্ধারণ করে দেয়া আছে। এর বেশী মুজাহিদ একই সময় জিহাদের ময়দানে যেতে পারবেন না। এদেশের কতজন মুসলমানের জন্য সম্ভব হিজরত করে আফগানিস্তান

কিংবা ইরাক চলে যাওয়া? যদি হাতে গুনা ১০০ / ১৫০ জন ভাই যেতেও পারেন, বাকী শত-শত ভাইদের কি হবে? তারা কি ঘরে বসে থাকবেন? উদাহরনস্বরূপ পাকিস্তান এর ওয়াজিরিস্থানে এখন মুজাহিদীনরা শক্তি সহ অবস্থান করছেন। কিন্তু পাকিস্থানের শহরের মুজাহিদ ভাইরা কি করছেন? তারা কি দল বেধে সবাই ওয়াজিরিস্থানে চলে গেছেন। না বরং তারা বিভিন্ন শহরে কিভাবে জিহাদকে ছড়িয়ে দেয়া যায় সে প্রচেষ্টা করছেন। ঠিক তেমনি জিহাদকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদেরকে যার যার এলাকায় কাজ করতে হবে।

• অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে গেলে সেই জায়গার আমিররা যার যার আশেপাশের জিহাদের ময়দানে যেতে বলেন। যেমনঃ কেউ যদি এই দেশ থেকে জিহাদ করতে ইয়েমেনে যায়, তবে তাকে এশিয়াতে অর্থাৎ পাকিস্থান কিংবা আফগানিস্থানের ময়দানে যেতে বলা হয়। যাতে সেখান থেকে এই এলাকার উপযোগী জিহাদ শিখে তিনি আবার নিজ দেশে কাজ করতে পারেন। নিজের এলাকায় আপনি যত ভালভাবে জিহাদের কাজ করতে পারবেন অন্য জায়গায় তা এত সহজে কখনই পারবেননা। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, জলবায়ু থেকে শুরু করে অস্ত্র সরবরাহের জন্য বিকল্প রাস্তা, মুজাহিদদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা, দ্বীনে আনসার তৈরি এসব কাজের জন্যই নিজের দেশেই সর্বোচ্চ জিহাদের খেদমত সম্ভব। আর অন্য জায়গায় গেলে ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, জলবায়ু এগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোই একটা কঠিন ব্যাপার। কিছু নেতৃস্থানীয় ভাইদের পক্ষেই সম্ভব এসব জায়গায় গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে নিজ দেশে এসে একইভাবে মারেকা প্রস্তুতির জন্য কাজ করা। সবার পক্ষে আবু মুসা'ব আল জারকাবী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি সেই মর্যাদাবান মুজাহিদ যিনি আফগানিস্তানে জিহাদের খেদমত দিয়ে পরবর্তীতে আবার ইরাকে যেয়ে জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

• আমাদেরকে ভয় দেখানো হয় এই দেশ ভারত দিয়ে পরিবেষ্টিত। এখানে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। আসলে হিন্দুদের গোলামরাই আমাদের মাথায় এই ভয় ঢুকাতে চায় যেন তাদের দাদারা আরামে থাকে। মূলতঃ এই ভূমি কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যদি সিরিয়ার মত হলেও একটা এলাকায় হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করা যায় আসাম, আরাকান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানরা এখানে হিজরত করতে আসতে পারবেন। আর সাথে সাথে যা হবে পূর্ব ভারতের সাতটি অঙ্গ রাজ্যেও ভারতবিরোধী বিদ্রোহ অত্যন্ত চাঙ্গা হবে। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বের অন্যতম হারবী কুফফার ভারতের জন্য হবে এটি বিশাল আঘাত। এই পৌত্তলিক মুশরিকরাও এটা ভালো মতই বুঝে তাই এরা সবসময় এই মুরতাদ শাসকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, ট্রানশিপমেন্ট চায়, এখানে মুসলমানদের উপর এখন অবর্ণনীয় নির্যাতনের ইন্ধন যোগায়। এরা কাশ্মীরে তো মুসলমানদের রক্ত, জান-মালের ক্ষতি করছেই; সাথে আফগানিস্তান, মালি এসব জায়গায় আর্থিক অনুদানও দিয়ে আসছে। কাজেই, এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের উচিত নিজের জানমাল দিয়ে এই ভূমিতে জিহাদে যোগ দেওয়া।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

আমরা যদি সারা বিশ্বে মারেকার সংখ্যা দেখি ১০ বছর আগে কতটি ছিল আর এখন কতটি আছে তাহলেই আমাদের কাছে সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে বর্তমান জিহাদের মানহাজ কি। ১০ বছর আগে যেখানে মারেকা ছিল বড়জোর দুইটি এখন বিশ্বে মারেকা ১০-১২ টি। আমাদের অনেক ভাই এখন আবার সিরিয়াতে/মালিতে হিজরতের স্বপ্ন দেখছেন। তাদের কাছে প্রশ্ন তাদের এখানে এই মারেকা কিভাবে সৃষ্টি হল? সেখানেও তো মুসলমানদের উপর যে কাফির/মুরতাদ শাসক ছিল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমেই এই ফসল এসেছে। সেখানে তো প্রথমেই কোন ইহুদী-নাসারারা আক্রমণ করেনাই। আমরা কি শুধু তাহলে ফলবান বৃক্ষ থেকে ফল পেতে চাই? নাকি আমরা নিজেরাও গাছের চারা লাগিয়ে ফল পর্যন্ত গাছের যত্ন নিয়ে সেই ফল পেতে চাই?

আমাদের লাঞ্ছনার কারণ : দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা

সাইফ আল ইসলাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِثَوْبَانَ كَيْفَ أَنْتَ يَا ثَوْبَانُ إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ كَتَدَاعِيكُمْ عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ مِنْهُ قَالَ ثَوْبَانُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّه أَمِنْ قِلَّة بِنَا قَالَ لَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنُ قَالُوا وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ حُبُّكُمْ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتُكُمْ الْقِتَالَ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি তিনি সাওবান (রা:) কে বললেন, হে সাওবান! তুমি কি করবে যখন মানুষ তোমাদেরকে আক্রমন করার জন্য আহবান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাঁদর সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অন্যকে আহবান করে।' সাওবান (রা:) বললেন, হে আল্লাহ রাসূল(স:) আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?' তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত কিন্তু,তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আল-ওয়াহ্হান কি?' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা।' (মুসনাদে আহমদ, খন্ডঃ ১৪, হাদিস নম্বরঃ ৮৭১৩, হাইসামী বলেছেনঃ হাদিটির সনদ ভালো, শুয়াইব আল আরনাউতের মতে হাদিসটি হাসান লি গাইরিহি)

সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ

حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।' (সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ, হাদিস হাসান)

এই হাদিস নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় আসলেই রাসূল(সা.)-কে 'অল্পকথায় অনেক কথা প্রকাশ করা'র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিলো। এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্য রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা, তাদের মূল সমস্যা এবং তার সমাধান নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদিস থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে নীচে উল্লেখ করা হলো:-

প্রথমত : 'তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য লোকজন একে অন্যকে আহবান করবে, যেভাবে খাবারের জন্য আহবান করা হয় ।'

সত্যিই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ দলে দলে বিভক্ত, আল-কুরআনও সুন্নাহ হতে দূরে সরে যাওয়ার কারণে । এই অবস্থায় দুনিয়ার অন্যান্য জাতি, মুসলিম উম্মাহর উপর সরাসরি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং একে অন্যকে আক্রমণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে যেমন: ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ফিলিস্তান, কাশ্মীর, মায়ানমার ইত্যাদি- সেটা তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য হোক অথবা খনিজ সম্পদ দখলের জন্য হোক অথবা অর্থনৈতিক বাজার দখল করার জন্য হোক ।

কেউ আক্রমণ করছে সরাসরি আগ্রাসী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে, কেউবা কূটনৈতিক (diplomacy) এর মাধ্যমে, কেউবা আদর্শিকভাবে (ideologically), কেউবা সংবাদ মাধ্যম, প্রিন্ট কিংবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে, কেউবা তাদের আবিস্কৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা রপ্তানী করে তাদের মানসিক দাস তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । আর এক্ষেত্রে তারা গণতন্ত্র রক্ষা, মানবতা, নারী-মুক্তি, শিশু-অধিকার, সবার জন্য শিক্ষা, সামাজিক-উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের মোড়কে তাদের কার্যক্রমকে ঢেকে নিয়েছে ।

বস্তুতঃ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর থেকেই পশ্চিমাবিশ্ব মুসলিম উম্মাহর উপর এই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত, এটা যারাই আল-কুরআনে বর্ণিত আনআম (গবাদি-পশু) এর মতো নয়, তারাই জানেন ও বুঝেন ।

দ্বিতীয়ত : 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?' তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা তখন অগণিত হবে ।'

এখান থেকে বুঝা যায়, বেশি সংখ্যক হওয়া ইসলামের কোনো demand নয় । ইসলাম চায় quality, সংখ্যা এখানে মূখ্য নয় । আল্লাহ চেয়েছেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম' (আ'মালুন সালিহান), এটা চাননি যে, 'তোমাদের মধ্যে কে আমলে বেশি' (আ'মালুন কাছিরান) ।

বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিলো মুসলিমদের তিনগুণ । ইয়ারমুকের যুদ্ধে কাফিররা ছিলো মুসলিমদের ৭০ গুণ । উভয় যুদ্ধেই মুসলিমরা বিজয়ী হয় । অপরদিকে, হুনায়ুনের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো, কাফিরদের চেয়ে বেশি । কিন্তু সে যুদ্ধে তারা পরাজয়ের দাঁড় গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর রহমতে বিজয় আসে । আফসোস, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ, তাদের সংখ্যাধিক্যের statistics নিয়ে ব্যস্ত, কোন ধর্ম সবচেয়ে বেশি গতিতে বেড়ে চলেছে, কোন দেশে মুসলিম Growth rate কত ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তারা ব্যস্ত; কিন্তু মুসলিমদের quality নিয়ে কোনো চিন্তা হচ্ছে না । অথচ আল্লাহ আল-কুরআনে বারবার বলেছেন, বিজয় শুধুমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসে, আর তাঁর বিজয় দানের ওয়াদা শুধু মুমিনদের জন্য ।

তৃতীয়ত : 'তোমরা হবে সমুদ্রের ফেনা রাসির মতো, যা স্রোতে সহজেই ভেসে যায় ।'

এটা হচ্ছে, বেশি সংখ্যক হওয়ার পরও মুসলিম উম্মাহর এই অবস্থার বর্ণনা । সাগরের ফেনার যেভাবে কোনো শক্তি নেই, শুধু উপর থেকে দেখতে অনেক মনে হয়, অন্যদিকে নিচের পানির স্রোত তাকে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যায় । মুসলিম উম্মাহও সংখ্যায় বেশি, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তাদের কোনো say নেই । তাদের প্রতিটি দেশই সুদভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে পরিচালিত, আল-কুরআন সুন্নাহ বিবর্জিত পশ্চিমাবাদের আবিস্কৃত গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদী-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের দেশগুলি পরিচালিত হচ্ছে । আর ইসলামের গন্ডি শুধুমাত্র মসজিদ ও কতিপয় পারিবারিক আইনে সীমাবদ্ধ । এ যেন সংখ্যায় বেশি হয়েও তারা Minority. কাফের-মুশরিক-ইসলামের শত্রুরা ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে কিন্তু মুসলিমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের একটি কথাও বলতে পারে না । অথচ সমুদ্রের ফেনা রাশির মতোই মুসলিম উম্মাহ ও সংখ্যাধিক্য নিয়ে আনন্দিত, উল্লাসিত, গর্বিত ।

চতুর্থত : 'আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের মধ্যে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দিবেন ।'

এখান থেকে দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয় ।

ক. মুসলিমদের শত্রু আছে, মিত্র আছে । ইসলাম কোনো বৈরাগ্যবাদী ধর্ম নয়, কিংবা 'অহিংস পরমধর্ম' প্রকৃতির গৌতমীয় বাণীতে বিশ্বাস করে না । বরং, ইসলামে ভালোবাসা ও ঘৃণা (আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ)একটি গুরুত্বপূর্ণ concept । অনেক modernist Ges self-defeatist মুসলিম যাদের মন-মগজ পশ্চিমা শিক্ষা-ব্যবস্থা, ডিস, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে সঠিক ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে, তারা যতই এ ব্যাপারটায় তাদের বিদেশি বন্ধুদের কাছে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়েন না কেন । আল্লাহর রহমত, তিনি আল-কুরআন ও সহীহ হাদিসকে অবিকৃত রেখেছেন । না হলে এরা ইসলামকে বিকৃত করে কোথায় নিয়ে যেতো । আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদি ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে । আল্লাহ

জালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' (সুরা-মায়েদা : ৫১)

মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে, বিজাতীয় প্রভুদেরকে বন্ধু অভিভাবক করে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

খ. মুসলিমদের উচিত তাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা। আর তাদের অন্তরে আমাদের ভয় থাকাটাই normal scenario. যদি না থাকে, বুঝতে হবে, কোনো সমস্যা আছে। কারণ রাসূল (সা.), আমাদের দুরবস্থার একটি কারণ হিসেবে তাদের মনে, আমাদের ভয় না থাকাকে উল্লেখ করেছেন।

আর আল্লাহ তো পবিত্র কুরআনে ঘোষণাই দিয়েছেন, যা বেশির ভাগ মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী তাদের কুচকাওয়াজে না বুঝে যন্ত্রের মতো পাঠ করে থাকে।

'আর তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যদ্দারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ করো তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে, আর তোমাদের সাথে কখনো জুলুম করা হবে না।' (সুরা-আনফাল : ৬০)

তাই কাফিরদের মনে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা মুসলিমদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত ফরজ। কে আছে এমন যে আল্লাহর এই হুকুমকে অস্বীকার করতে পারে। আর এক্ষেত্রে মুসলিমরা শুধু 'চোরের কাছে পুলিশ যে রকম ত্রাস সৃষ্টি করে' যা ডা. জাকির নায়েক বলে থাকেন, সে রকম ত্রাস সৃষ্টিকারী নয়, বরং 'সুলায়মান (আ.) যেভাবে কোনো প্রকার ভয়, ছাড়াই বিলকিসের রাজত্বে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন' সে রকমও ত্রাস সৃষ্টিকারী।

এটা ছিলো, আমাদের প্রথম সমস্যা, আর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের মাঝে 'ওয়াহ্হান' ঢুকিয়ে দিবেন।

পঞ্চমত : 'জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.), ওয়াহ্হানকি?' তিনি জবাব দিলেন, 'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা' অথবা মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা, ওয়াহ্হান হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। ক্বিতাল ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা। আর এটা হবে, তখনই যখন আমরা

করেছে? এর পরেও কি তুমি তার কাজের জিম্মাদার হতে চাও?' (সুরা-ফুরকান : ৪৩)

উপরে বর্ণিত নফসের দাস এবং 'গবাদি-পশুর মতো' লোকজন; তাদের ব্যাপারতো বলাই বাহুল্য। আসলেই, তাদের শৈশব, কৈশোরে, পড়ালেখা করে চাকরি নেওয়া, টাকা আয় করে পরিবারের ভরণপোষণ করা, বিয়ে করে পরবর্তী বংশধর উৎপাদন করা, বৃদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার মধ্যে 'গবাদি-পশুর' সাথে অনেক মিল পাওয়া যায়। গবাদি পশুর মতোই, এই দুনিয়াই তাদের ultimate লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি: যখন:তোমরা ঈনা নামক (সুদী) ব্যবসায় জড়িত হয়ে যাবে, আর গরুর লেজ-এ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, তিনি তা উঠিয়ে নিবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না যাবে।' (আবু দাউদ:৯৪৬৫)

জান্নাত-জাহান্নাম থেকে চোখ ফিরিয়ে দুনিয়ার দিকে মনোযোগ দিবো। অনেক ইসলামপন্থীদের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা হারিয়ে কিংবা নিজের কৌশল, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির উপর অত্যাধিক ভরসা করতে দিয়ে আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করা, সুন্নাহের বিরোধিতা করা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে apparently ইসলামের basic দাওয়াত, শিক্ষা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া, 'হেকমত', 'পরিস্থিতির প্রয়োজন' কিংবা 'পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট' ইত্যাদি শব্দের আড়ালে এসবই আল ওয়াহ্হানের ফসল। আর বাকি যারা আছেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

'তুমি কি তাকে দেখ না যে তার খেয়াল খুশিকে ইলাহরূপে গ্রহণ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, জান্নাত-জাহান্নাম এসব কিছুই তাদেরকে এক চুল ও নাড়াতে পারে না বরং তাদের TV সিরিয়াল কিংবা অফিসে বসে মনের ইচ্ছা বহুগুণ বেশি move করায়। টাকা আয়,

খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে-শাদি, মৃত্যু ছাড়া তাদের জীবনে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া, ভালোবাসা, aim, vision নেই। অথচ তারা মুসলিম। আল্লাহ, ইসলাম ও মুসলিমদেরকে এই 'গবাদি-পশুর' আজাব থেকে রক্ষা করুন।

আর মৃত্যুকে ভয় মানুষ তখনই পায়, যখন তার জন্য প্রস্তুতি কম থাকে। আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি কম থাকা মানেই মুসলিম হিসেবে আমরা আমাদের করণীয়গুলো যথাযথভাবে করছি না, হয়তো আমরা ইসলামের কিছু কিছু নিয়ম-কানুন, রসুমাত-রেওয়াজ পালন করি, কিন্তু নিজের জীবনে ইসলামকে ধারণ করিনি,

ইসলাম আমাদের জীবনের Mission and Vision হয়ে উঠেনি-যা মুসলিম মাত্রই হওয়ার কথা ছিলো।

আর আল্লাহ তাআ'লা এ ব্যাপারটিই কুরআনে বলেছেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? অতএব তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং ক্বিয়ামাতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন।' (সুরা-বাক্বারা : ৮৫)

যখন থেকে আমরা মৃত্যুকে মনে করবো-তা আমাদের আমল ঘর জান্নাতের প্রবেশ দ্বার, যখন থেকে আমরা এই দুনিয়াকে নিজের জন্য জেলখানা মনে করবো, কিংবা মনে করবো কোনো transit camp শুধু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি, কিংবা যখন থেকে আমরা আল্লাহর রাস্তায় ক্বিতালকে আমাদের লাঞ্ছনা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে জানবো, তখন আমরা এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠত : উপরোক্ত দুটি সমস্যার সমাধান, এমন কি মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিসের মধ্যে।

তিনি বলেছেন–

عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: سمعتُ رسولَ الله –صلى الله عليه وسلم– يقول : «إذا تبايعتم بالعِينَة ، وأخذتم أذناب البقَر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد : سَلّط الله عليكم ذُلا لا يَنْزِعُهُ عنكم حتى ترجعوا إِلى دينكم

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি: যখন:তোমরা ঈনা নামক (সুদী) ব্যবসায় জড়িত হয়ে যাবে, আর গরুর লেজ-এ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, তিনি তা উঠিয়ে নিবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না যাবে।' (আবু দাউদ:৯৪৬৫)

তাই আমাদের সমস্যা কোনো টাকা-পয়সার, বা technology, business এর কমতি নয়, গরুর লেজ অর্থাৎ agriculture-এর কমতি নয়, যা অনেক তথাকথিত ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা মনে করে থাকেন। বরং আমাদের সমস্যা অন্য কোথাও। আমাদের লাঞ্চনার কারণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেয়া, ক্বিতাল করতে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুকে ভয় করা আর দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে বেশী ভালোবাসা।

আর তার সমাধান হচ্ছে, পরিপূর্ণভাবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ তথা আল্লাহর দ্বীনে ফেরত আসা।

হে আল্লাহ আমাদের মন থেকে আল ওয়াহ্হান দূর করে দিন এবং আমাদের শত্রুদের মনে আমাদের ভয় সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদেরকে আপনার দ্বীন ইসলামে-যা একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা, একমাত্র গ্রহণযোগ্য Ideology, একমাত্র গ্রহণযোগ্য আইন-বিধান-শিক্ষা ও আদর্শ, তাহজীব তামাদ্দুন-এ পরিপূর্ণভাবে ফিরে যাওয়ার তওফীক দিন।

আমীন।

সতর্কতা- Firefox WebSocket bug TOR এর গোপনীয়তাকে মুছে দিচ্ছে

আমান রায়হান

বিসমাল্লাহির রহমানির রাহিম

আপনি যদি TOR browser bundle ব্যবহার করে থাকেন, সেইখানে একটি বাগ আছে আপনার উচিত সেটি খুব দ্রুত বন্ধ করা।

টাইপ করুন about:config। ফায়ারফক্স এর address field এর ভিতর তা লিখুন এবং Enter এ ক্লিক করুন।

এরপর টাইপ করুন network.websocket.enable। এইটি search field এর ভিতর লিখুন এবং Enter এ ক্লিক করুন।

এরপর আপনি একটি রো দেখতে পাবেন যেখানে একটি কলামে By default 'True' দেওয়া থাকবে। আপনাকে এইটি 'False' করতে হবে। রো এর উপর ডাবল ক্লিক করলেই তা 'False'হয়ে যাবে। এখন সকল কিছু ভালোভাবে চলবে ইনশাআল্লাহ।

এটি ছিলো একটি TOR Browser bundle এর DNS leak bug। উপরের নিয়মটি অনুসরন করে আপনি সহজেই তা দূর করতে পারেন। সকল বিপদ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
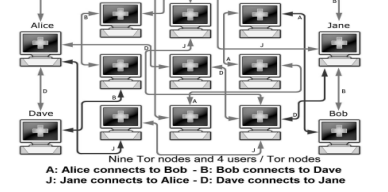
আদা

মসলা জাতীয় ফসলের মধ্যে আদা অন্যতম। আদা খাদ্যশিল্পে, পানীয় তৈরিতে, আচার, ঔষধ ও সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া মুখের রুচি বাড়াতে ও বদহজম রোধে আদা শুকিয়ে চিবিয়ে খাওয়া হয়। এছাড়াও সর্দি, কাশি, আমাশয়, জন্ডিস, পেট ফাঁপায় আদা চিবিয়ে বা রস করে খাওয়া হয়। এই ঠান্ডায় আদা ভীষণ উপকারী।
এতে রয়েছে এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট, যা শরীরের রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে। জ্বর জ্বর ভাব, গলাব্যথা ও মাথাব্যথা দূর করতে সাহায্য করে।

বমি বমি ভাব দূর করতে এর ভূমিকা কার্যকর। তাই বমি বমি ভাব হলে কাঁচা আদা চিবিয়ে খেতে পারেন। এতে মুখের স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

অসটিও আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এই অসুখগুলোয় সারা শরীরের প্রায় প্রতিটি হাড়ের জয়েন্টে প্রচুর ব্যথা হয়। এই ব্যথা দূর করে আদা। তবে রান্না করার চেয়ে কাঁচা আদার পুষ্টিগুণ বেশি।

মাইগ্রেনের ব্যথা ও ডায়াবেটিসজনিত কিডনির জটিলতা দূর করে আদা। গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ করে গর্ভধারণের প্রথম দিকে সকালবেলা শরীর খারাপ লাগে। কাঁচা আদা দূর করবে এ সমস্যা।
দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, আদার রস দাঁতের মাড়ি শক্ত করে, দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা জীবাণুকে ধ্বংস করে। দেহের কোথাও ক্ষতস্থান থাকলে তা দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে আদা। এতে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট, যা যেকোনো কাটাছেড়া, ক্ষতস্থান দ্রুত ভালো করে। এই ঠান্ডায় টনসিলাইটিস, মাথাব্যথা, টাইফয়েড জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ হওয়া, বসন্তকে দূরে ঠেলে দেয় আদা। ওভারির ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আদা।

আমলকি

আমলকি এক প্রকার ভেষজ ফল। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম 'আমালিকা'। ইংরেজি নাম 'aamla' বা 'Indian gooseberry'। আমলকি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Phyllanthus emblica ev Emblica officinalis।
আমলকি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ফলগুলোর মধ্যে একটি। আমলকি খেলে অনেক রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বা অনেক রোগ সেরে যায়। পরিচর্যায় মায়ের মত উপকারী তাই একে ধাত্রীফলও বলা হয়। আমলকিতে পেয়ারার চেয়ে আড়াই গুণ, লেবুর চেয়ে সাড়ে চার গুণ, আমের চেয়ে ১০ গুণ, কমলার চেয়ে ১১ গুণ, আমড়ার চেয়ে ৫ গুণসহ সব ফলের চেয়ে দ্বিগুণ থেকে ১০০ গুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে। আমলকি দামে সস্তা। প্রতিদিন মাত্র একটি আমলকি খেয়ে আমাদের প্রতিদিনের ভিটামিন সি এর চাহিদা পূরণ করতে পারি। গাছ থেকে সংগ্রহের পর থেকে ধীরে ধীরে এর ভিটামিন সি নষ্ট হতে থাকে। তাই আমলকি অবশ্যই তাজা খেতে হবে। আমলকি শরীর ঠান্ডা রাখে, রক্ত, মাংস ও হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, পায়খানা স্বাভাবিক রাখা ও পুরুষের দেহে বীর্য বর্ধক হিসাবে কাজ করে। চোখের জন্যও আমলকি বিশেষভাবে উপকারী।
নিম্নে ১০০ গ্রাম আমলকিতে কি পাওয়া যায় তা বর্ণনা করা হলো–
'প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকিতে আছে–
পানি- ৯১.৪ গ্রাম,
খনিজ -০.৭ গ্রাম,
প্রোটিন - ০.৯ গ্রাম,
ক্যালসিয়াম - ৩৪.০ মিগ্রা,
আয়রণ - ১.২ মিগ্রা,
ভিটামিন বি১-১০.০২ মিগ্রা,
ভিটামিন বি২-২০.০৮ মিগ্রা,
ভিটামিন সি-৪৬৩ মিগ্রা।

কলমিশাক

কলমিশাক অত্যন্ত সুপরিচিত। শহরে নগরে সর্বত্র কিনতে পাওয়া যায়। গ্রামে, খালে-বিলে ও পুকুরে কলমি লতা ভাসতে দেখা যায়। কলমি ফুল দেখতে সুন্দর। কলমিশাক ভাজা ও ঝোল রান্না করে খাওয়া যায়। তবে বড় কথা হলো কলমিশাক খুবই উপকারী। কলমিশাক দুই প্রকার। যথা-ডাঙ্গা কলমিশাক ও জল কলমিশাক। ডাঙ্গা কলমিশাক গাছ দিয়ে ফসলের ক্ষেতের বেড়া দেয়া হয়। জল কলমিশাক খাওয়া যায়। কলমির পাতা বেটে ফোঁড়ায় লাগালে পেকে পুঁজ বের হয়ে যায়। ত্বক চিকেন পক্স উঠলে কলমিশাক খেলে ভেতরের পক্স তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসে।
শরীর ও পেট গরম হলে কলমিশাক খেলে ভালো হয়। কলমিশাক দিয়ে সকাল-বিকেল ভাত খেলে মায়ের বুকের দুধ বাড়ে।
শিশুদের কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হলে রাতে দুধের সঙ্গে পাঁচ ফোঁটা কলমি পাতার রস খাওয়ালে কোষ্ঠকাঠিন্য ভালো হয়। ডায়াবেটিক রোগীরা প্রতিদিন কলমিশাক খেলে উপকার হয়।

যেসব লোকের ফোঁটায় ফোঁটায় প্রস্রাব হয় সারাক্ষণ, তারা কলমিশাক খেলে উপকার হয়।

Home About

attibyean jan 2013

Posted on January 20, 2013

মাসিক আত তিবইয়ান

ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: attibyean.tk

মাসিক আত তিবইয়ান-এ

আপনার লিখা পাঠান: attibyean@gmail.com

প্রাপ্তি স্থান:

১. হাসান কম্পিউটার
টাউন হল, বরগুনা
মোবাইল:
০১৯১৫৯৮৯৬৬০

২. বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী
হাজীর পুকুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর।
০১৭৭৪৯৫৯৯৯১

৩. মদিনা ইসলামিক লাইব্রেরী
মোল্লা মার্কেট, পানিসাইল, জিরানী বাজার, ঢাকা।
০১৭১৬৭৫৭২১৮

৪. মাকতাবাতুল মাজহার
১৫৪/বি, রোড # ১৯ (পুরাতন), প:ধানমন্ডি, মধুবাজার, (বড় মসজিদের উত্তর পাশে), ঢাকা।
০১৭২০৯০০২২৮